ক্ষমতা মিডিয়া আর মানুষ

বাধন অধিকারী

বাস্তবতাকে বর্ণনা করা হয় যখন, তখন তা আর বাস্তবতা থাকে না। বর্ণনা করতে গিয়ে আসলে বাস্তবতাকে নির্মাণ করা হয়। গোলকায়নের/বিশ্বায়নের নাম করে পুঞ্জিভূত পুঁজি আর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার আন্তর্জাতিকীকরণের এই যুগপর্বে, ক্ষমতাশালী গুটিকয়েক রাষ্ট্র আর কর্পোরেশন মিলে যে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা নির্মাণ করে; তাতে জ্ঞান-ক্ষমতা-সত্য পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। এই সম্পর্কসূত্র বিপন্ন করতে চায় সামগ্রিক মানুষের ভাষা-অধিকার। ছিনিয়ে নিতে চায় তথ্য-অধিকার। মানুষকে করে তুলতে চায় পণ্যমোহাচ্ছন্ন, ক্ষমতা-অনুগত পরাধীন, ভোগবাদী। আরসব পরিচয় মুছে ফেলে স্রেফ ক্রেতা-বিক্রেতা পরিচয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ করতে চায় তাকে। এভাবেই আমাদের সামনে হাজির হয় মার্কেট-মিডিয়া-মিলিটারি যুগপর্বের ঐতিহাসিক বাস্তবতা। আবার এরই বিপরীতে থাকে মানুষের বিদ্রোহী চৈতন্য/ প্রতিরোধের সহজাত বাসনা। নতুন মিডিয়ার গণতান্ত্রিক প্রাযুক্তিক-বৈশিষ্ট্য সেই প্রতিরোধ-বাসনার গায়ে হাওয়া লাগায়। রচিত হতে থাকে নতুন দিনের স্বপ্ন-সম্ভাবনা।

মুক্ত মানুষের মুক্ত ভাষার মুক্ত মিডিয়ার মুক্ত সমাজ লেখকের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের পাটাতনে দাঁড়িয়ে লেখক চিহ্নিত করেছেন অবৈধ ক্ষমতাকে। সেই ক্ষমতা হিসেবে এবং সেই ক্ষমতার নির্মাণে মিডিয়ার ভূমিকাকে শনাক্ত করেছেন। খুঁজে দেখেছেন মানুষের উপর তার অভিঘাত। অন্যদিকে নয়া প্রযুক্তির নতুন মিডিয়াকে সাথে নিয়ে নির্দিষ্ট করেছেন মনুষ্য-প্রতিরোধের জমিন। সবমিলে ক্ষমতাশালীদের নির্মিত তৃতীয় দুনিয়ার বাংলাদেশ নামের এই জাতিরাষ্ট্রে বিরাজমান মার্কেট-মিডিয়া-মিলিটারি বাস্তবতা আর প্রতিরোধের পাল্টা বাস্তবতার স্বপ্ন-সম্ভাবনার অনুসন্ধান করা হয়েছে এই বইয়ের ছোট-বড় ১৬টি লেখায়।

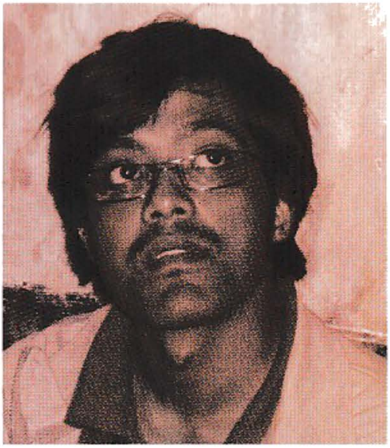

বাধন অধিকারী

বগুড়ায় জন্মেছেন ১৯৮৪ সালে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। কাজ করেছেন জাতীয় দৈনিক *কালের কণ্ঠের* সম্পাদকীয় পাতায়। প্রতিষ্ঠানের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কাজ ছেড়েছেন মাত্র চার মাসে। এর অনেকদিন পর অনলাইন পত্রিকা *রাজনৈতিক ডট কম*-এর অনলাইন সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন কিছুদিন। সেটাও ছেড়ে এখন জীবিকাহীন।

একদা মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী, এখনকার স্বাধীন-সমাজতন্ত্রী বাধন অধিকারী ছাত্রজীবনে বন্ধুদের সাথে নিয়ে *অভীপ্সা* নামে একটা ছোটকাগজ বের করতেন। জড়িত ছিলেন ছোটকাগজ আন্দোলনের সাথে। কোনদিন কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে নিজের নাম না জড়িয়েও মুক্তিকামী প্রতিরোধ আন্দোলনের সামিল থেকেছেন যেভাবে-যতোটা পারা যায়। সেনা-কর্পোরেট কর্তৃত্বের অগণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে সংঘঠিত ছাত্রবিক্ষোভের একজন সক্রিয় সংগঠক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় দৈনিকে কিছু কলাম ছাড়া তার লেখালেখির মাধ্যম মূলত ছোটকাগজ ও ওয়েব মিডিয়া। সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতি-মিডিয়া নিয়ে লিখতে গিয়ে বাধন আসলে নিজেকে আর নিজের সাথে জড়িত অন্যান্য অনুষঙ্গকে সাথে নিয়ে নিজের পরিসরে বিরাজমান যে বাস্তবতা– তাকেই লিখে যান।

ক্ষমতা মিডিয়া আর মানুষ

বাধন অধিকারী

ক্ষমতা মিডিয়া আর মানুষ

রাষ্ট্র-রাজনীতি-মিডিয়া বিষয়ক ১৬টি রচনার সঙ্কলন

বাধন অধিকারী

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি বইমেলা, ২০১২

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : রীবন আহসান

শ্রাবণ প্রকাশনী
১৩২ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)

শাহবাগ, ঢাকা–১০০০। ফোন : ৮৬৫১১৬০
www.shrabonprokashani.com
shrabongraphic@yahoo.com
www.shrabonbd.com

মূল্য : ১৫০ টাকা

Price : 150 Tk.

ISBN : 978-984-8827-67-3

Khomota Media ar Manoosh (Essays on State Politics and Media) by Badhan Adhikari. Published by Rabin Ahsan, Srabon Prokashon, Aziz Co-operative super market, Shahbag, Dhaka. Date of Publication: February Book Fair, 2012

উৎসর্গ

সেলিম রেজা নিউটন;

আমার শিক্ষক-বন্ধু-সহমর্মী।

GRONTHO.COM

GRONTHO.COM

লেখকের কথা

২০০৪ সালে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম যে দিনটিতে; সেইদিন থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলাম, কিছু একটা করতে হবে। ভর্তি হবার আগে ছোটমামার সুবাদে পাওয়া কমিউনিজমের দীক্ষা, আর মামা-মামার বন্ধুদের সুবাদে পাওয়া সেলিম রেজা নিউটন আমার এই 'কিছু একটা করতে হবে' ভাবনার প্রেরণা-উৎসাহ-প্ররোচনা জুগিয়েছিলেন। একাডেমিক জমিনে, নিজের ক্লাসরুমে একদিকে সাংবাদিকতার নীতি-আদর্শ-বস্তুনিষ্ঠতা-আইনকানুনসহ যাবতীয় স্থিতিকে মহিমান্বিত করে সেটা গেলানোর চেষ্টা; আরেকদিকে সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাস-উন্নয়ন-মিডিয়া-বাস্তবতার ভিন্ন পাঠ নিয়ে যেদিন মাস্টার্স শেষ হলো একটা যেনতেন ফার্স্টক্লাস নিয়ে; সেদিন এসে দেখা গেলো করা হয়নি প্রায় কিছুই। অথচ কতো কিছু করার কথা ছিল।

কর্পোরেট মিডিয়াকে প্রতিদিন পরখ করে দেখা, আর নিজেদের বিকল্প মিডিয়া তৈরি করার চেষ্টা করাটা আমাদের কাজ; এই সত্যটা টের পেয়েছিলাম প্রথম বর্ষেই। সেদিন থেকেই কত কিছু করতে চেয়েছি। কখনও ভেবেছি একটা বিকল্প সংবাদপত্র বানাবো যেখানে প্রথম পাতায় রাজধানী নয়, থাকবে বাংলাদেশের গ্রাম। কখনও ভেবেছি একটা দৈনিক বানাব, দিনের শেষে যা সবগুলো মূলধারার পত্রিকার অ্যানালাইসিস নিয়ে বের হবে। কখনও ভেবেছি নিদেনপক্ষে একটা ভালো অনলাইন পত্রিকা বানাতে হবে যা সাংবাদিকতার প্রথাগত ধারণা পাল্টে দেবে। সম্পাদক-সংবাদকর্মী ক্রমতন্ত্র, হাউস-পলিসি নামের মতাদর্শিক ক্ষমতা, নিরপেক্ষতার নামে বিশেষ পক্ষপাতের বাইরে এসে প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশের সৃজনশীল বিকাশের পক্ষে থেকে মুক্ত-স্বাধীন সাংবাদিকতা করে যাবে! করা হয়নি প্রায় কিছুই! কেবল একটা কাজ হয়েছে। পড়াশোনার মাঝামাঝি অবস্থায় অনার্স শেষ করে জাতীয় দৈনিক *কালের কণ্ঠের* সম্পাদকীয় পাতায় একটি চাকরি নিয়ে ৪ মাস পর সেখানে ইস্তফা (*কালের কণ্ঠ* অবশ্য আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ না করে উল্টো আমাকে অব্যহতিপত্র দিয়েছিল) দেয়ার পর নিজেকে কর্পোরেট মিডিয়াতে চাকরি করবার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে চিনতে পারার কাজটা সম্পন্ন হয়েছে।

এরপর মাস্টার্সের রেজাল্টের পর হঠাৎ-ই নিজের মধ্যে খবর হলো, মার্কেট-মিডিয়া-মিলিটারি যুগে স্রেফ টিকে থাকবার জন্য চাকরি জাতীয় কিছু একটা না করে আমার মতো নিম্নমধ্যবিত্তের বেচে থাকার উপায় নাই। গ্রামে বাপ-মায়ের কয়েক বিঘা জমি থাকলে চাষ করে খেতাম, অথচ আমাদের থাকবার একটা বাড়ি ছাড়া এক ইঞ্চিও জমি নাই। শিক্ষিত-চাকরিজীবী বাপ-মায়ের ছেলে বলে রিকশা চালাতে পারব না কোনদিন, কুলির কাজ করবার শক্তি নেই, আসলে শ্রমিকতার সুস্পষ্ট বোধ নাই। তাই চাকরি একটা করতেই হবে। কিন্তু বিসিএস দিয়ে আমলা হতে পারব না, ব্যাংকে বসে টাকার মধ্যে- হিসেব-নিকেশের মধ্যে থাকতে পারব না, এনজিওতে বসে গণবিরোধী/অদরকারী কাজ করতে পারব না। কী করব আমি? নিজের নীতি-আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে একটা পেশা নির্বাচন করব এমন পেশা আছে নাকি!

একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পারলেই ঐ 'কিছু একটা করতে হবে' নামের স্বপ্নটা জিইয়ে রাখা যাবে বলে এই কয়েকদিন আগে এসে জীবনে প্রথমবারের মতো একটা চাকরির

আনুষ্ঠানিক আবেদন করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার/দ্বিতীয়বার পড়বার জন্য। আবেদনপত্রকে ঋদ্ধ করতে নিজের যোগাযোগ-সংশ্লিষ্ট কাজের হিসেব-নিকেশ দিতে গিয়ে কেবল আবিষ্কার করা গেল; বেশ কয়েকটা লেখা জমে গেছে গত কয়েক বছরে, যেগুলো একজায়গায় করলে কিছু একটা দাঁড়াবে। সুনির্দিষ্ট কোন বোঝাপড়া দাঁড়াবে এমন দাবি করতে পারব না, বড়জোড় বলতে পারব; একাডেমির মধ্যে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী আর একাডেমির বাইরে একজন স্বপ্ন দেখা মানুষ হিসেবে; যোগযোগ আর মিডিয়ার মধ্যে কীভাবে আমি নিজেকে আর নিজের সমাজটাকে দেখছি, কী কী দেখছি, কীভাবে সেই দেখাটায় পরিবর্তন আসছে, কী কী পরিবর্তন আসছে।

জীবন আর জীবিকার দ্বন্দ শেষ পর্যন্ত কোথায় টেনে নিয়ে যাবে জানি না, 'একটা কিছু করতে হবে'র কী হবে তাও জানি না, এই লেখাগুলো একজায়গায় মিলে একটা বই অন্তত হোক। তাতে অন্তত সাংবাদিকতার ছাত্র/অছাত্র আগ্রহীদের একটা সুযোগ থাকে আমাকে বিচার করবার। আমার সাথে আলাপ করবার। সেই তাড়না থেকেই এই বই।

বইয়ে কোন অপ্রকাশিত রচনা নেই। ২টি রচনা ফেইসবুকে প্রকাশিত। বাদবাকি লেখাগুলো মোহাম্মদ আরজু সম্পাদিত অনলাইন সংবাদপত্র *রাজনৈতিক ডট কম*, মুজীব মেহদি সম্পাদিত জার্নাল *নারী ও প্রগতি*, তৈমুর ফারুক তুষার সম্পাদিত পত্রিকা *সাগ্নিক*, মুসতাক আহমেদ সম্পাদিত বই *গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি: নয়া তথ্যযুগে পুজিবাদ ও গণতন্ত্র*, জোছনা লিপি সম্পাদিত এমএমসির মাসিক প্রকাশনা *মুক্তপ্রকাশ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের মুখপাত্র *প্রমিথিউস*, আরাফাত আলী সিদ্দিকী সম্পাদিত পত্রিকা *অরোরা*, সুদীপ্ত শর্মা ও জমশেদুল করিম সম্পাদিত বই *বাজারের যুগে মিডিয়া*, আ-আল মামুন সম্পাদিত রাবির গণযোগযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০ বছর পূর্তি উৎসব-প্রকাশনা *যোজন* এবং আবেদ খান সম্পাদিত *কালের কণ্ঠে* প্রকাশিত হয়েছে। এই সম্পাদকদের বন্ধু-সহযোদ্ধা-কমরেড থেকে শুরু করে শিক্ষক-বস পর্যন্ত আছেন। সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি আমায় তাঁরা প্রকাশিত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে।

'বই করো', 'বই করো' বলে যিনি সব সময় তাগাদা দিয়েছেন তিনি সেলিম রেজা নিউটন। অনেক কষ্ট করে আমার লেখাগুলোকে একজায়গায় করে প্রাথমিক বানান দেখার কাজটা করেছেন পিতম মুস্তফী; আমার অকৃত্রিম ভাতৃপ্রতিম বন্ধুজন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বানান দেখে দিয়েছেন রাবির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক বন্ধু-সুহৃদ-বড় ভাই মাহাবুব অনিন্দ্য। প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন *সকালের খবরের* সিনিয়র রিপোর্টার বন্ধু-সুহৃদ উদিসা ইসলাম। এছাড়া পার্থ প্রতিম দাস, খান বেনজির আহমেদ বাধন এই লেখাগুলোর হয়ে ওঠার সাথে কোন না কোনভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রিয়জনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নাই।

সবশেষে শ্রাবণ প্রকাশনীর স্বত্বাধীকারী রবীন আহসানের প্রতি কৃতজ্ঞতা, মুনাফার বাজারে অখ্যাত এক তরুণকে প্রকাশিত হবার সুযোগ দিলেন বলে।

ডিসেম্বর, ২০১১ **বাধন অধিকারী**

GRONTHO.COM

রচনা-সূচি

১. গোলকায়নের এই যুগে জাতিরাষ্ট্রের ভাষা বনাম স্বাধীন চিন্তা ১
২. নারীর উপর ভাষিক আধিপত্য: প্রান্তে তাঁর পাল্টা-ভাষা ১১
৩. ব্যান কালচার এবং সেক্যুলার রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চেহারা... ২৩
৪. নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র আর বন্ধ মঙ্গলধ্বনি ২৫
৫. এসো বাংলাদেশ গড়ি: সেনা-কর্পোরেট কর্তৃত্বের গাড়িতে চড়ে বাংলাদেশের নিও লিবারাল দুনিয়ায় ভ্রমণপর্ব ২৭
৬. অস্ত্রধারী *প্রথম আলো* এবং সেনা-কর্পোরেট-সুশীল কর্তৃত্বের শপথ: আমাদের বদলে দেয়া আর বদলে যাওয়ার প্রশ্ন ৩৯
৭. শ্রমিক আন্দোলন ও মূলধারার মিডিয়া: গার্মেন্টস শ্রমিকের অসন্তোষ যখন *প্রথম আলোর* নৈরাজ্য ৪৯
৮. স্থানীয় সংবাদপত্রের পাঠক: স্বপ্ন-সম্ভাব্যতার নিরিখে ৬৫
৯. এমটি (শূন্য) বাংলাদেশ নির্মাণপর্ব: সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয়তার প্রশ্নের বিবেচনায় টিফা-ট্রানজিট-টাস্কফোর্স নিয়ে আলাপচারিতা ৬৯
১০. মার্কেট-মিডিয়া-মিলিটারি যুগের বাংলাদেশে মেসি-মনমোহন-মমতারা... কিংবা আমরা ৭৭
১১. মিডিয়াচারণ: কৃষ্ণকলির গান থেকে বিজ্ঞাপনে... ৭৯
১২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক: নিও লিবারাল যুগের সম্পর্কের নেটওয়ার্ক ৮৩
১৩. *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত পিৎজা হাটের বৈশাখী বিজ্ঞাপন: পণ্যযুগে মানবীয় সম্পর্কের পাঠ ৯১
১৪. ওবামা-ওসামা লাইভ সম্প্রচার: আরব জাগরণের সময় হত্যা-সংবাদ আর লাদেন-ভাইরাস! ৯৯
১৫. মিডিয়ার গর্ভে ঐশ্বরিয়ার অনাগত 'জমজ' সন্তান ১০৩
১৬. মৌমাছি আর এই যুগের মানুষেরা ১০৭

গোলকায়নের এই যুগে
জাতিরাষ্ট্রের ভাষা বনাম স্বাধীন চিন্তা

GRONTHO.COM

পুবের ঐ উদ্বোধনে পশ্চিমের বোধন হোক/ একুশে ফেব্রুয়ারি আমার আলো আমার চোখ/ যে চোখের জন্য এমন হন্যে এমন আকুল হলাম/ সে-নয়নে আমার অধিকার/ এ নয়ন আমার আশা আমার ভাষা আমার অঙ্গীকার। [একুশে ফেব্রুয়ারি। কবির সুমন। অ্যালবাম: চাইছি তোমার বন্ধুতা]

মানুষের মুক্তির প্রশ্নে ভাষা ও চিন্তার সম্পর্কসূত্র

পশ্চিমবঙ্গের গায়ক কবীর সুমন বাংলা ভাষার প্রতি যেমন করে অঙ্গীকার জানান দিতে গান বিঁধেছেন একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে; একইরকম করে ভাষার জন্য সংগ্রামী আমাদের পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীর প্রতি অঙ্গীকারের যন্ত্রণাবোধে ভাষা-অধিকারের প্রশ্নে লিখতে বসেছি। আমাদের পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীরা বলেছিলেন, প্রথম বিপ্লবের খুন বের হবে ভাষা থেকে। বলেছেন সঙ্গত কারণেই। ভাষা আর চিন্তাতে কোনো ভেদ নেই। ভাষাই যখন চিন্তা আর সেই চিন্তাই যখন কাজের (চিন্তা নিজেও কাজই বটে!) মানে তৎপরতার আদি, তখন তো এটাই হবার কথা। ভাষা থেকে তথা চিন্তা থেকেই বিপ্লবের শুরু। চিন্তাই আমাদের অস্তিত্বের নির্ধারক। চিন্তা করি বলেই আমরা জানি যে, আমরা আছি। দেকার্তের কাছে এটা শিখেছি। এই চিন্তা ভাষার বাইরে দাঁড়ায় না কোনোভাবেই। ভাষার বাইরে আমরা কোনো চিন্তা করতে পারি না। তাই চিন্তাই ভাষা। ভাষাই চিন্তা। সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ভাষা-অধিকারের প্রশ্ন চিন্তা করবার অধিকারের প্রশ্নও বটে। ভাষার বাইরে যখন চিন্তার কোনো অস্তিত্ব নাই তখন নিজ ভাষার অধিকার বঞ্চিত মানুষ নিজ ভাষায় চিন্তার অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

মানুষ সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে সক্ষম। ভাষাতত্ত্বের উছিলায় নোম চমস্কি আমাদের জানান দিয়েছেন মানুষের সৃষ্টিশীলতার কথা। পূর্ববর্তী আচরণবাদী ভাষাতত্ত্বের জমিনকে অতিক্রম করে চমস্কি রচনা করেছেন সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের তত্ত্ব। মানুষ যখন জন্মের পর নির্দিষ্ট কিছু শব্দ শিখেই কারও কাছে শোনা বাক্য নয় শুধু, প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন বাক্য তৈরিতে সমর্থ হয় তখন আর ভাষাকে মানুষের আচরণের অংশ ভাবা যায় না– এই বলে মত দেন চমস্কি, আর সেখান থেকে মানুষের ভাষা-সামর্থ্যের গভীরে গিয়ে দেখতে পান প্রতিটি মানুষ সহজাতভাবে ভাষা-ক্ষমতা সম্পন্ন না হলে এমন নিত্য-নতুন বাক্য তৈরি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব না। ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজেশন ডিভাইস (Language acquisition device) নামে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে একটি স্পেসকে কল্পনা করেন চমস্কি, যেখান থেকে মানুষের ভাষা-সামর্থ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে চমস্কির বাসনা; সামগ্রিক মানুষের ভাষা-সক্ষমতা যখন সহজাত তখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভাষার একটি অভিন্ন ব্যাকরণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। খুঁজতে গিয়েই চমস্কি তৈরি করেন রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের তত্ত্ব। আজ চমস্কিকে সাথে নিয়ে, আবার কোথাও কোথাও তাকে অতিক্রম করে ভাষাতত্ত্ব আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে। বিকশিত হয়েছে সাইকোলিঙ্গুইস্টিক (Psycholinguistics)। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত কলিম খান ক্রিয়াভিত্তিক

শব্দার্থবিধির মাধ্যমে রামায়ন-মহাভারত খুঁজে বের করে এনেছেন ভারতবর্ষের অন্য ইতিহাস। অভাব-অনটন উপেক্ষা করে কলিম খান ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান তৈরি করে যাচ্ছেন রবি চক্রবর্তীকে সাথে নিয়ে। সবমিলে মনুষ্যপ্রজাতির ভাষার অভিন্ন সূত্র আবিস্কারের পথে ভাষাতাত্ত্বিক অগ্রগতি আমাদের জন্য আশীর্বাদ, চিন্তাশীল মানুষের অর্জন। তবে সেসব ভাষাতাত্ত্বিক মীমাংসার আলোচনা আমার আজকের প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়।

নোম চমস্কির প্রসঙ্গ এই আলাপে জরুরি হয়ে উঠলো যে; তার কারণ ভাষাতাত্ত্বিক মীমাংসা নয়, কারণটা রাজনৈতিক। চমস্কির ভাষাতত্ত্ব মানুষকে সহজাতভাবে সৃজনশীল বিবেচনা করে। আর এই বিবেচনা থেকেই আমরা প্রেরণা পাই সমস্ত অন্যায্য ক্ষমতা-কর্তৃত্ব-আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর। চমস্কির ভাষাতত্ত্ব এই বিরুদ্ধতার নৈতিক জমিন তৈরি করে। সৃজনশীল মানুষ তথা স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার সক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য আছে, অন্যের দ্বারা শাসিত হবার দরকার নেই। শাসন-কর্তৃত্ব তাই অবৈধ-অন্যায্য। আর সে কারণেই সৃষ্টিশীল ব্যক্তিমানুষের সামগ্রিক স্বাধীনতার (ভাষাগত-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক যাবতীয় অর্থে) নিশ্চয়তা বিধান করতে পারলেই কেবল যথার্থ মানবিক পৃথিবীর দেখা মিলবে।

দ্বিজাতিতত্ত্ব আর ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার পর্যালোচনা

বাংলায় বায়ান্ন সালের আত্মত্যাগ আর বিদ্রোহ ওই ভাষিক আধিপত্য থেকে মুক্তির লড়াই। বাংলা ভাষায় স্বাধীন চিন্তাক্ষম সৃজনশীল মানুষদের ওপর উর্দু আরোপের অন্যায্য সিদ্ধান্তের বিরোধিতাই ছিলো একুশের প্রাণ। কিন্তু তার বিস্তৃতি ছিলো অনেক দূর পর্যন্ত ব্যপ্ত। বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে বর্ণ হিন্দুর দাসত্ব থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের এই জনপদের মানুষেরা দ্বিজাতিতত্ত্বের কাধে ভর করেই লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলো। বিনিময়ে পেয়েছিলো পাকিস্তান নামে ঔপনিবেশিক কাঠামোর এক জাতিরাষ্ট্র, যেখানে এই জনপদ হয়েছিলো উপনিবেশ। দাসত্ব যে ঘোঁচেনি এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মাথায়। এই জনপদের মানুষের উপর অন্যায্যভাবে চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো উর্দু ভাষা। রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো জনপদের মানুষের বিপরীতে। তাই ভাষা আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহল্লা-গ্রাম পর্যন্ত। আওয়াজ উঠেছিলো রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই! কিন্তু প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক, রাষ্ট্রভাষা উর্দু মানে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ভাষা উর্দু।

বাংলাদেশের বিশাল কৃষক শ্রেণীর সাথে রাষ্ট্রভাষার সম্পর্ক কি? রাষ্ট্র-পরিচালনার সাথে যাদের কোনো যোগাযোগ নাই তারা কেন রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সোচ্চার হয়েছিলো? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত আছে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে শুরু করে যাবতীয় রকমের দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামের প্রশ্ন। পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত কৃষকের (পাট উৎপাদনের মাধ্যমে যাদের অর্থনৈতিক জীবনের স্ফীতি ঘটেছিলো) সন্তানেরা তখন কলেজ-

বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাষ্ট্রের চাকরি-বাকরিতে তাদের অন্তর্ভূক্তির প্রশ্ন জড়িয়ে ছিলো ভাষা-অধিকারের সাথে। তাই ভাষা আন্দোলন শুধু শিক্ষার্থীদের ভাষা-অধিকারের আন্দোলন ছিলো না। তাতে জড়িয়ে গিয়েছিলো পূর্ব বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রশ্নও।

আর সত্যিই প্রথম বিপ্লবের খুন ভাষা থেকেই বের হয়েছিলো। বায়ান্ন'র ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা-অধিকারের প্রশ্নে প্রথম বিদ্রোহী এই জনপদের মানুষেরা প্রাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে ভাষার দাবি। সঙ্গে সঙ্গে তাদের এও বোঝা হয়ে গেছে দ্বিজাতিতত্ত্ব তাদের মুক্তি দিতে পারেনি। এমন একটা সমাজ দিতে পারেনি যেখানে সুযোগ আর অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। বৃটিশ-মুক্ত হলেও তারা নতুন উপনিবেশের খপ্পরে পড়েছে। তাই আবারও উপনিবেশ মুক্তির সংগ্রামে নেমেছে এই জনপদের মানুষ। এবার ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাই ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের জায়গায় অন্য জাতীয়তার তত্ত্ব আনলেন। ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ। জনগণ আরেকবার পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পিঠে সওয়ার হয়ে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্ন-সংগ্রামে গড়ে তুলল একাত্তর। আর এভাবেই পৃথিবীর বুকে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে জন্ম নিলো এক নতুন রাষ্ট্র, বাংলাদেশ।

পাঠককে খেয়াল রাখতে অনুরোধ জানাই, জনগণ আর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আমি আলাদা জ্ঞান করছি। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্মাণ। কিন্তু জনগণের দিক থেকে এগুলো কিন্তু একেবারেই নিজেদের দাসত্ব মুক্তির সংগ্রাম। বৃটিশ আর বর্ণহিন্দুর প্রকোপ থেকে বাঁচতে তারা দ্বিজাতিতত্ত্বের পিঠে সওয়ার হয়ে সংগ্রাম করেছে। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তান তাঁদেরকে মুক্তি দেয়নি। তেমনি করে নয়া উপনিবেশ পাকিস্তানকে মোকাবিলা করতে গিয়ে তাঁরা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার পিঠে সওয়ার হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাসখ্যাত সাবঅলটার্ন তাত্ত্বিকদের লেখা পড়ে আমি আরও নিঃসন্দেহ হয়েছি, ভারতবর্ষে নিম্নবর্গের জনতার বিপুল সম্পৃক্তি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে থাকলেও তার প্রকৃতি ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মতো একটি রাষ্ট্র বানিয়ে তার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার রূপকল্প ছিলো না তাদের দিককার আন্দোলনের পেছনে। বাংলাদেশের বাস্তবতাও ভিন্ন হবার নয়। এখানেও আধিপত্যশীল সম্পর্কসূত্র পাল্টানোর জন্য সংগ্রাম করেছে নিম্নশ্রেণীর মানুষ। রাষ্ট্র বানিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার জন্য নয়। কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বদলে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের এই উত্থান এবং তার ভিত্তিতে যে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গড়ে উঠলো সেটার পটভূমি-পর্যালোচনা না করলে একুশের চেতনার সাথে বেঈমানি করা হয়।

আলোচনার সুবিধার্থে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি বখতিয়ার আহমেদ-এর লেখা থেকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতির বছরে তিনি লিখেছেন:

> ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আদতে পাশ্চাত্য সভ্যতার রস নিষিক্ত এই অভিজাত সম্প্রদায়টির পশ্চিমা অংশীদার বিবর্জিত কিন্তু পাশ্চাত্য ধাচের নিজের একটি রাষ্ট্রকাঠামোর অধিকর্তা হয়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষারই রাজনৈতিক অভিপ্রকাশ। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন সে অর্থে ভারতে বৃটিশ বিপ্লবেরই ফলাফল। উপলব্ধিটি একটু অস্বস্তিকর হতেই পারে। কিন্তু রাষ্ট্র ধারণাটির সাথে আমাদের বৃহদাংশ গণমানুষের চৈতন্যগত ছেদটি মূলত আধুনিক রাষ্ট্র ধারণার সাথে তার সাংস্কৃতিক ছেদ। এই ছেদ ঘোচাতেই কোনো ধর্ম বা বর্ণের পরিচয় নয়, সংকীর্ণ কোনো জাতীয়তাবাদ নয়, ভাষাকে যুথজীবীতার সূত্র করে একুশের পলাশ রাঙা বুক জুড়ে ইতিহাসে পৃথিবীর মানবিকতম রাষ্ট্রটির স্বপ্নই দেখেছিলো সেদিন। [সূত্রঃ ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা প্রশ্নে আমাদের জাতিরাষ্ট্রঃ 'একুশে' যখন মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্মারক, *মাওরুম*, অপরাজেয় ভাষা সংকলন মার্চ ২০০৬, ঢাকা]

কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রও এই জনপদের মানুষকে মুক্ত করেনি। এই জনপদের প্রতিটি মানুষের সুযোগ আর অধিকারের সমতা আসেনি। জাতিরাষ্ট্র আজ নিও লিবারাল পুঁজির সেবকের ভূমিকা পালন করছে এই মার্কেট-মিডিয়া-মিলিটারি যুগে এসে।

অধিপতি জাতীয়তাবাদের হুমকির মুখে মানুষের ভাষা-অধিকার

তরুণ লেখক ইমন দাশগুপ্ত যথার্থই খেয়াল করেছেন, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার এই রাষ্ট্রে বাংলা ভাষা কী করে একক-একমুখী-আধিপত্যশীল সম্পর্ক নির্মাণের মধ্যে দিয়ে অধস্তনতার রাজনীতিকে বহাল রেখেছে আগের মতোই। এবারের একুশে ফেব্রুয়ারির আগের দিনটি- ২০ ফেব্রুয়ারি এই আধিপত্যের সাক্ষী। টুকে রাখা অত্যন্ত জরুরি যে, যখন এই লেখাটি লিখছি তখন মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলনকারী ৪ চাকমা তরুণসহ ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ক্ষমতাসীন বাঙালি জাতীয়তাবাদী সরকার । এই দেশের সচেতন-পরিবর্তনকামী তরুণরা ব্লগে-ফেইসবুকে এই ভাষার মাসে ভাষা-অধিকারের দাবিতে সোচ্চার মানুষের এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করছেন। খোমেনি ইহসান লিখেছেন, 'যেই রাষ্ট্র এমন কাজ করতে পারে, সেই রাষ্ট্রের একুশে উদযাপন স্রেফ ভণ্ডামী। এই রাষ্ট্রতো একুশের চেতনা বিরোধী জিন্নাহর সময়কালের বর্বর পাকিস্তান মাত্র।' খোমেনি ইহসানের কথার সাথে এই কথাটা বলে রাখাটা সঙ্গত যে, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে স্বৈরশাসক-সেনাশাসক-আর বাঙালি জাতীয়তাবাদী এই সরকার না শুধু, ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় থাকা পূর্ববর্তী জাতীয়তাবাদী সরকারও জাতিরাষ্ট্রের সমগ্র মানুষের ভাষা-অধিকারের প্রশ্নটিকে আড়াল করে রেখেছে দাপুটে ক্ষমতার জোরে।

এই ক্ষমতাকেই আমি জাতীয়তাবাদের ক্ষমতা বলে উল্লেখ করছি। এইযে, মাতৃভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের ভিত গড়ে তোলা একটা জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীর ভাষা অধিকারকে দমন করতে জেলে ঢোকায়, সেই ইতিহাসকে আমলে না নিলে আমাদের চলে না। উপনিবেশিক ক্ষমতা-কাঠামোর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যায্য ক্ষমতা-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একুশকে আমরা অর্জন করেছি, অর্জন করেছি বাংলাভাষাকে। সেই বাংলাভাষাই আধিপত্যশীল ভূমিকায় চড়াও হয়েছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষাগুলোর উপর। আজ নিও লিবারাল পুঁজির পক্ষে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা নির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলাভাষা। কেন এমন হলো? এই প্রশ্নটা তুলতে গেলে খোদ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকেও প্রশ্নবিদ্ধ না করে পারা যায় না যদিও আমাদের অগ্রজদের মধ্যে বাম-ডান নির্বিশেষে এটাকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রম সংশোধন বলে মামলাটা চুকিয়ে ফেলবার চলটাই প্রবল। কিন্তু আজ এসে (অতীতের অভিজ্ঞতাও আলাদা নয় সেটা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না) একুশের মাসে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা অধিকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় বিদ্বেষ, গ্রেপ্তার-হয়রানি দেখেও কি এই প্রশ্ন আমরা তুলব না যে, তবে কি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদও মুক্তির পথ নয়?

ভাষা আর সৃজনশীল মানুষের স্বাধীনতার সম্পর্ককে আমলে নিয়ে আলাপ শুরু করেছিলাম। এবার ভাষার সাথে ক্ষমতার সম্পর্কসূত্রকে পরিষ্কার করবার দরকার বোধ করছি। ভাষা আর চিন্তার সমার্থকতাকে যখন আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই, তখন ভাষিক আধিপত্যের মানে দাঁড়ায় চিন্তার আধিপত্য। ভাষা আর ক্ষমতার সম্পর্কসূত্র আজকের দিনে এসে আরও অনেক বেশি পরিষ্কার হয়েছে যখন পাশ্চাত্যে বসে মিশেল ফুকো ডিসকোর্স ধারণাকে বিকশিত করেছেন। ফুকো ডিসকোর্স দিয়ে বোঝান ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের উৎপাদনকে। জ্ঞানের নির্মিতিতে মিডিয়ার ভূমিকা যখন ভাষার, ভাষা তখন নিজেই একটি ক্ষমতা। আবার আরেকদিক থেকে দেখলে ভাষা দিয়ে ক্ষমতার নির্মাণ ঘটে। প্রাচ্যের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন বই-পত্র-পত্রিকা-সিনেমা-নাটকে প্রকাশিত হয় তা তো ক্ষমতারই বহিপ্রকাশ। সে ক্ষমতা প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায়, একইসাথে ভাষা হিসাবে ইংরেজিও ক্ষমতার অধিপতি হয়ে ওঠে।

ক্ষমতা সম্পর্কের অধীনে বাংলা ভাষার ইতিহাসের দিকে অর্থাৎ তার রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখি, টিকে থাকার স্বার্থে বাংলাকে সবসময় লড়াই করতে হয়েছে। বাংলা ব্রাত্যজনের ভাষা, নিম্নবর্গের ভাষা হিসেবে মোকাবিলা করেছে অধিপতি ভাষাসমূহের। ফার্সি ও সংস্কৃতের সংস্কৃতির মোকাবিলা করেছে বাংলা। সেই সূত্র ধরে এগোলে, বাংলা ভাষার ইতিহাস বিচার করতে গেলেও টের পাওয়া যায় যে, এভাবে একটি ভাষার সাথে অন্য ভাষার সম্পর্ক আসলে ক্ষমতার সম্পর্ক। ভাষার এ অসম ক্ষমতার পুনরুৎপাদন আবার আমরা খেয়াল করি বৃটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার

সময়। ইংরেজি তখন সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণীর ভাষা– অধিপতি ভাষা। ইংরেজির সেই আধিপত্যের সময়েও ১৮৬৭ সালে অন্য এক বিতর্কে বাংলা ভাষার অনুপস্থিতি আমাদের চোখে পড়ে। মুসলমানের ভাষা কি হবে সেই নিয়ে হিন্দি ও সঙ্গে উর্দুর বিতর্কে এই প্রস্তাব ছিল যে উর্দুকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র ভাষা করতে হবে। স্যার সৈয়দ আহমদ এবং মৌলভী আবদুল হকরা বলছিলেন। পুরো বিতর্কেই বাংলার প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। পাকিস্তান আমলেও আবার বাংলাকে লড়তে হয়েছে। নিজের বিকাশের জন্য মর্যাদার জন্য তাকে প্রতিমূহুর্তে আধিপত্যকামী ভাষার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। আর আজ ঐ ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে যে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের রূপকল্প দাঁড়িয়েছিলো স্বাধীন সেই জাতিরাষ্ট্রে বাংলা ভাষা আবার অসম ক্ষমতা সম্পর্কে জড়িয়েছে আদিবাসী-পাহাড়ি প্রান্তিক জাতিগুলোর ভাষার সাথে।

ভুবনগায়ে ভাষাযুদ্ধের হাল চাল

ইউনেস্কো জানান দিয়েছে প্রতি ১৫ দিনে হারিয়ে যাচ্ছে একটি করে ভাষা। ক্ষমতা-আধিপত্যের সম্পর্কসূত্রের মধ্যেই এই বাস্তবতাকে পড়তে হবে। পুঁজিবাদের এই তথাকথিত মুক্তবাজার-অর্থনীতি পর্বে, মানে আন্তর্জাতিক পুঁজির বিশ্বায়িত বাস্তবতায় এসে আগের থেকেও আরও প্রকটভাবে দুনিয়ার আর সবকিছুর মতো করেই ভাষাকেও মাপা হয় বিনিময়ের মূল্যে। আর্থিক বিবেচনায়। ইংরেজিওয়ালারা সমৃদ্ধ, তাই ইংরেজি ভাষার দাম বেশি। জাপান নিজের সমৃদ্ধির জন্য ইংরেজদের ধার ধারে না, তাই জাপানে ইংরেজির কদর নাই। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাভাষাভাষী মানুষেরা অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী। আর এখানেই বাংলা হয়ে ওঠে আধিপত্যবাদের নিশান। ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীর ভাষার উপরে। কলিম খান সেই কবেই লিখেছিলেন ভুবনগায়ে [গোলকায়নের যুগের পৃথিবীকে কলিম খান এই নামে ডাকছেন] ভাষাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে!

আর ইউনেস্কোর ওয়েব সাইটে যে তথ্য পাচ্ছি তাতে অবাক হইনি, কিন্তু ভীত হয়েছি নিঃসন্দেহে। ২০০৮ এর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কো প্রকাশ করেছে 'বিপন্ন ভাষা'র মানচিত্রের নতুন সংস্করণ। অস্ট্রেলিয়ার ভাষাবিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার মোসলের সম্পাদনায় সারা পৃথিবীর ৩০ জন ভাষাতত্ত্ববিদের পরিশ্রমে তৈরি হয়েছে এবারের মানচিত্র। যা থেকে জানতে পারছি, ৬০০০ ভাষার মধ্যে ২৪৯৮ টিই বিপন্ন। পাঁচ রকমের বিপন্নতায় ভাগ করা হয়েছে বিপন্ন ভাষাগুলোকে। শিশুরা এ ভাষায় কথা বলে, কিন্তু সব সময় সব জায়গায় বলে না এমন ভাষাগুলোকে বলা হয়েছে বিপন্ন। এই বিপন্ন ভাষার সংখ্যা ৬০৭ টি। মাতৃভাষা হিসেবে শিশুরা ঘরেও আর যে ভাষাটি শেখে না সেটাকে ইউনেস্কো বলছে নিশ্চিতভাবে বিপন্ন ভাষা। এমন ভাষার সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে ৬৩২ টি। দাদা-দাদিরা বা বুড়ো প্রজন্ম এ ভাষায় কথা বলে, বাবা-মারা বা তাদের প্রজন্ম সে ভাষা বুঝতে পারে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে তারা এ ভাষায় কথা বলে না এবং শিশুদেরও ভাষাটি আর শেখায় না সেই ভাষাকে বলা হয়েছে ভয়াবহ বিপন্ন।

এই ভয়াবহ বিপন্ন ভাষার স্যংখা ৫০২ টি। বুড়ো প্রজন্মই শুধু ভাষাটি ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেকেই ভাষাটি ভুলে গেছে এবং যারা জানে তারাও সব সময় সে ভাষায় কথা বলে না তেমন ভাষাগুলোকে ইউনেস্কো নাম দিয়েছে চূড়ান্ত বিপন্ন ভাষা। এমন ভাষার সংখ্যা ৫৩৮ টি। আর কেউই আর যে ভাষাটিতে কথা বলে না সেটিকে বলা হয়েছে বিলুপ্ত ভাষা। এরকম ২১৯টি ভাষাকে বিলুপ্ত হিসেবে শনাক্ত করেছে ইউনেস্কো।'আর সেই ভাষাযুদ্ধের বিশ্বযুদ্ধে বাংলা ভাষাও আজ আধিপত্য ও অধীনতার সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। বাংলাদেশে পাঁচটি ভাষাকে বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ককবরক, বিষ্ণুপ্রিয়-মণিপুরী, কুরুক্স এই তিনটি বিপন্ন, বম নিশ্চিতভাবে বিপন্ন এবং সাক ভয়াবহ বিপন্ন।

এখন যেমন শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-এলিট-শ্রেণীর বাংলা একাডেমী এখন 'অ-প্রমিত' বাংলা ভাষা শনাক্ত করে শায়েস্তা করার চেষ্টা করছে, তাদের আবিষ্কৃত 'প্রমিত' বাংলাকে একমাত্র বাংলা হিসেবে ক্ষমতাবান করবার জন্য। এর শুরু সেই উপনিবেশের সময়ে। সেই উপনিবেশের কালে বাংলা ভাষার মধ্যে সেই সভ্যতার চেতনা রোপনে ভাষাগত বিভাজন তৈরি করা হয়েছে। চাকরের ভাষা চাষার ভাষা বনাম বাবুর ভাষা প্রভুর ভাষা, সাহিত্যিক ভাষা বনাম অসাহিত্যিক ভাষা, প্রমিত ভাষা, অ-প্রমিত ভাষা এমনই অসম ক্ষমতা সম্পর্কের নিরিখে নির্মিত হয়েছে নানা বিভাজন। ভাষার ওপর রাজনৈতিক প্রভাবের ফলেই ভদ্রলোকি বাংলার সঙ্গে শ্রমজীবী কৃষক জনগোষ্ঠীর মুখের বাংলার এ দ্বন্দ। আনুষ্ঠানিক বাংলা এবং আঞ্চলিক বাংলার মধ্যেও এই অসম ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে। সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর ভাষার অধিকারের নামে যেমন করে জাতিরাষ্ট্রের মালিকানা হাতিয়ে নিয়েছেন ধনিক শ্রেণী আর তাদের উপপদগোষ্ঠীরা, তেমনি করে ভাষা-অধিকারও হয়ে দাঁড়িয়েছে মুষ্টিমেয়র অধিকার। বাংলা ভাষা এখন আধিপত্য করছে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলোর ওপর, প্রায় বিলীন বিপন্ন করে দিচ্ছে।

বেশিরভাগ জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে এরকম প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার প্রধান উন্নয়ন ধারার তথা গোলকায়নের, আরও নির্দিষ্ট করে বললে এই নিও লিবারাল বাজার-ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। বিশ্বায়নের নামে যে একচেটিয়াকরণ ঘটছে তা বস্তুত সব অঞ্চলের মানুষকে শৃঙ্খলিত করে ক্ষুদ্র অংশের একক ভাষা, সংস্কৃতি, মতাদর্শ, রুচি এবং একচেটিয়া মালিকানা সবার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, সাংস্কৃতিক-বাজার আধিপত্যের জায়গাগুলোকে আরও স্পষ্ট করছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন করে পুরো বিশ্ব কতিপয় বহুজাতিক সংস্থার অধীনস্ত হয়েছে; মতাদর্শিক ক্ষেত্রে যেমন করে শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতিগত, বর্ণগত নিপীড়ন ও মতাদর্শের স্পষ্ট-অস্পষ্ট একটি কাঠামোর আধিপত্য সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনি করে ভাষার ক্ষেত্রে আমরা দেখি অন্য সব ভাষার ওপর কয়েকটি ভাষার বিশেষত একটি ভাষার একচেটিয়া আধিপত্যের জমিন স্পষ্ট হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে সমগ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা অধিকারের প্রশ্ন আদতে ক্ষমতা-পুঁজির এই যুগের সম্পর্কগুলোকে পাল্টানোর প্রশ্ন। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাও যে সমগ্র মানুষের ভাষার অধিকারের প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারেনি সেটার কারণ একটি গণতান্ত্রিক সমাজ আমরা বিনির্মাণ করতে পারিনি। একুশের চেতনা আর আমাদের জাতিরাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক বিরোধাত্মক। রাষ্ট্র ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে বানানো হোক, আর ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে বানানো হোক সেটা মূল কথা না। মূল কথা হলো জাতিরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের অংশীদারত্বের প্রশ্ন মীমাংসা করা গেছে কি না। আমরা দেখতেই পাচ্ছি, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি-রাষ্ট্র ভাষা-প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারে না।

মুক্ত ভাষাই পারে মুক্ত পৃথিবীর জন্ম দিতে

আমরা সবসময়ই খেয়াল করি, প্রতিরোধ দ্রুত হোক বা দেরিতে হোক, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির এই যুগে এটা আরও প্রকটভাবে সত্য। জনপদে জনপদে ব্যক্তির মুক্তি ও স্বাধীনতার দাবিতে যেসব স্থানিক উদ্যোগ ঘটে তার মধ্যেও থেকে যায় বৈশ্বিকতার দাবি। প্রতিটি দেশে মানুষ লড়াই করেন তার নিজ দেশের অধিপতি শক্তির বিরুদ্ধে, অধিপতি মতাদর্শের বিরুদ্ধে। প্রতিটি দেশের মানুষ লড়াই করেন নিজের ভূমিতে তার জায়গা তৈরির জন্য। কিন্তু এসব লড়াই ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে। প্রতিটি দেশের মানুষের মুক্তির লড়াই অন্যান্য দেশের মুক্তিকামী শক্তিগুলোকে শক্তি জোগায়। এক দেশের মুক্তির আন্দোলন অন্য দেশের অধিপতি শক্তির জন্য হুমকি হয়ে ওঠে। সেই জায়গা থেকে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাও সারা দুনিয়ায় ভাষার লড়াইরত মানুষদের শক্তি যোগাতে পারে। অধিপতি ভাষাগুলোর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোকে উজ্জীবীত করতে পারে। আর জাতিসংঘ কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেবার মধ্য দিয়ে এই সম্ভাবনা একটু হলেও বেড়েছে। মানুষের ভাষা অধিকারের প্রতি অন্তত আনুষ্ঠানিক কাগুজে স্বীকৃতি এটা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস চালু করার বাইরেও জাতিসংঘের কিছু সক্রিয়তা চোখে পড়ছে। ইউনেস্কো বলছে তারা বিলুপ্ত হতে থাকা ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো বিশেষ লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিবেচনায় বলি, ইউনেস্কো ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভাষা সংরক্ষণ করবে! কী করে করবে তারা এটা? আগেই বলেছি, ভাষা তো শুধু ভাষা না। ভাষা নিজেই একটা বড় ক্ষমতা। বাংলাদেশে আধিপত্যশীল বাংলা ভাষার জোয়ার আর সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনে বাংলা ভাষাভাষীদের আধিপত্যের কবল থেকে যখন তারা নিজেরা বাঁচতে পারছে না, তখন আর আলাদা করে তাদের ভাষা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব না। ভাষা তো বেঁচে থাকে সংস্কৃতির মধ্যেই, আমরা কে না জানি। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যখন প্রবল, তখন কী করে ভাষা বাঁচবে? পাভেল পার্থ চমৎকার করে দেখিয়েছেন কী করে খুন হয়ে যায় আপন ভাষা, আপন পরিসর। সংস্কৃতি যদি না বাঁচে সেখানে যদি

কর্পোরেটের আঁচড় পড়ে যায়, যদি রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর অন্য আধিপত্যগুলো বহালই থেকে যায়, যদি নিজ ভাষার বাজারমুল্য না থাকে তবে শুধুই আইন করে কিংবা জাতিসংঘের উদ্যোগে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়ে কী করে বাঁচানো যাবে ভাষা?

তাহলে ভাষা-অধিকারের প্রশ্ন আজকের যুগে এসে কিন্তু বিশ্বায়িত বাজার তথা কর্পোরেট পুঁজি আর জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতা-সম্পর্কের পাটাতনে দাঁড়িয়েই মীমাংসা করতে হচ্ছে। তাতে কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এমনকি ভাষাভিত্তিকি জাতীয়তাবাদের প্রত্যয়ও! তাহলে বিশ্বায়নের এই যুগে সামগ্রিক মনুষ্যপ্রজাতির ভাষা-স্বাধিকারের প্রশ্নকে আমরা কী করে মোকাবিলা করব? ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত জাতিরাষ্ট্রও যখন সেই রাষ্ট্রের সব মানুষের ভাষার অধিকার রক্ষা করতে পারে না, যেখানে পুঁজি আর ক্ষমতার তোড়ে ভেসে যাচ্ছে বাজার-মূল্যবিহীন ভাষা সেখানে নতুন করে ভাষার দাবির লড়াই শুরু করব কোত্থেকে? জাতিরাষ্ট্রে আমাদের সুরাহা হয়নি, বিশ্বায়নের একচেটিয়াকরণ আরও বেশি হুমকি ডেকে এনেছে, তাহলে ভাষা অধিকারের প্রশ্ন আজকে এসে ঠিক কোন জায়গায় মীমাংসিত হবে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর নতুন জায়গা থেকে নতুন করে খুঁজতে হবে আমাদের। ভাষার জন্য আন্দোলনের ইতিহাস শুধু বাংলাদেশ নামের এই জাতিরাষ্ট্রের নাই। বাংলাতে শুধু বাঙালিরাই একমাত্র জাতি নয় যারা আপন মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছে এবং বুকের রক্ত ঝরিয়েছে। কিন্তু এই রকম উন্নাসিক চিন্তা ও মিথ্যা ভাষ্যের প্রচুর নজির আমরা পাই আমাদের গল্প ও ইতিহাসের বইগুলোতে এবং ইতিহাস নিয়ে বুদ্ধিজীবীতা করেন যারা সেই তাদের বয়ানে। এই ভাষ্য আমাদের শাসক-শ্রেণীর আধিপত্যশীল চরিত্রকে স্পষ্ট করে। মাতৃভাষার অধিকার নয়, বরং উর্দুর জায়গায় বাংলাকে শাসক-ভাষায় রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে শাসক শ্রেণীর আধিপত্যকে বহাল রাখবার সংকল্প জানান দেয়। এই ধরনের ভাবনা-ভাষ্য ভাষার জন্য আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর এই জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে প্রকারান্তরে প্রশ্নবিদ্ধ করে, বাংলাভাষী সংগ্রামী জাতি হিসেবে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত লজ্জিত করে। বাংলার জন্য শুধুমাত্র বাংলাদেশের বাঙালিরাই জীবন উৎসর্গ করেনি, করেছে আসামের জনগণও। এছাড়াও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা আন্দোলন ইতিহাসের আরেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এছাড়া প্রতিদিন ক্ষুদ্র-প্রান্তিক জাতিগুলির ভাষার লড়াই চলছে। আমরা টের পেতে চাই বা না চাই।

তবুও শেষে এসে বলি; আন্তর্জাতিভাবে স্বীকৃত একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সবথেকে বড় প্রেরণা। ফেব্রুয়ারির উত্তাপ ছিলো অমান্য করবার। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নিষেধ না মেনে ১৪৪ ধারা ভেঙেই রচিত হয়েছিলো একুশের রক্তমাখা দ্রোহী চৈতন্য। ক্ষমতাকে-কেন্দ্রকে-রাষ্ট্রকে অমান্য করেই একুশ এসেছিলো। একুশের চেতনা তাই অস্বীকারের চেতনা। প্রশ্ন করবার চেতনা। এই চৈতন্য থেকে প্রেরণা নিয়ে বিশ্বায়ন-জাতিরাষ্ট্র-জাতীয়তা-ভাষা অধিকারের প্রশ্নকে নতুনভাবে মোকাবিলা করবার শক্তি অর্জিত হোক আমাদের। সমস্ত নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীর ভাষা মুক্তি পাক। মুক্ত মনের

মুক্ত ভাষায় নির্মিত হোক মুক্ত পৃথিবী। এই লিখে ফেইসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম ২১ ফেব্রুয়ারি। বলতে চেয়েছিলাম, মুক্ত ভাষাই পারে মুক্ত পৃথিবীর জন্ম দিতে। মুক্ত ভাষা মানে মুক্ত চিন্তা। স্বাধীন চিন্তা।

রাজনৈতিক ডট কম; ২০১১

GRONTHO.COM

নারীর উপর ভাষিক আধিপত্য: প্রান্তে তাঁর পাল্টা-ভাষা

উৎসর্গ: কবি মনিকা রশিদ; আমার মনিকাদি, সুদূর প্রবাস থেকে যার দেশ-বিষাদের ছন্দ ভেসে আসে সাইবারস্পেসের মাধ্যমে, আমার একলা বিষন্ন দিনে...

পটভূমি

ভাষাকে কেন্দ্র বিবেচনা করে, এর সাথে ভাবনা-প্রতীক-অর্থ-ক্ষমতা-জ্ঞান-আধিপত্যের সম্পর্কসূত্রকে মিলিয়ে পড়তে গিয়ে, এই লেখার পটভূমি তৈরি হয়। ভাষা-সহযোগে নির্মিত আমাদের প্রতিদিনকার বাস্তব, আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতায় প্রতিদিনকার ভাষিক বিনিময় আর সেই ভাষিক বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদিত চিন্তাধারা ও তৎপরতা, ক্ষমতাশক্তির অপরাপর ধারাগুলোর সাথে এই জ্ঞানের কিংবা চিন্তাধারার সম্পর্কসূত্র, আর তারই বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের সহজাত ভাষা-ক্ষমতা, তার সৃজনশীল ভাষা তৈরির সক্ষমতা। এই ভাষিক-সক্ষমতার অসীম সম্ভাবনার কিনারে দাঁড়িয়ে খোদ ভাষা-কর্তৃক নারীর প্রতিদিনকার বাস্তবতা নির্মাণের পাঠ নিতে গিয়ে আরো অনেক কিছুর সাথে এটা দেখা হয়ে যায় যে, সমাজে প্রবহমান পুঁজি-প্রেষিত-পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার যে আধিপত্য, ভাষা খোদ সেই আধিপত্যের জমিনকে পোক্ত করতে থাকে তার নির্মিত অর্থ কিংবা নির্মিত জ্ঞানের মাধ্যমে। অর্থাৎ খোদ ভাষাই হয়ে দাঁড়ায় পুরুষতন্ত্রের দাস, তার বৃত্তে বৃত্তাবদ্ধ। ভাবনা যেহেতু ভাষাকে প্রভাবিত করে, আর ভাষা যেহেতু জ্ঞান তৈরির প্রধান হাতিয়ার এবং সেই জ্ঞান মানেই যখন ক্ষমতা তখন পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোতে ভাষা পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞানেরই উৎপাদন ঘটায়। এই লেখা চলমান এই পুরুষতান্ত্রিকতার বিপরীতে পাল্টা ভাষিক বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা করবার মাঝ দিয়ে পাল্টা ডিসকোর্স হাজির করবার বাসনাজাত।

ভূমিকা

হাজার হাজার বছরের জারিকৃত পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা আর তার নিরিখে নির্মিত ভাষা-সংস্কৃতিকে এক প্রবন্ধে কিংবা একদিনে নয়, বরং দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ পরিশ্রম দিয়েই কেবল মোকাবিলা করা সম্ভব। সেই কাজ যে একেবারেই শুরু হয়নি তা নয়। সেখানেই আমাদের আশা। সেখানেই আমাদের ভরসা। সেখানেই আমদের দায়িত্বও। এই প্রবন্ধে আমরা প্রথমে খোদ ভাষার অভ্যন্তরে কী করে একটা পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বাস করে আর কীভাবে তা নারীর উপর আরোপিত হয় তা আলাপ করবো ২/৪টা উদাহরণ-সমেত। সেই আলাপে ভাষার মাধ্যমে উৎপাদিত জ্ঞানে নারীর প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটছে সেটাকে আমরা চিনতে চেষ্টা করবো এবং পুরুষতান্ত্রিক বাস্তবতাকে চলমান রাখতে খোদ ভাষাই কীভাবে একটা মুখ্য শক্তি হয়ে ওঠে তা দেখব। এরপর আমরা পাল্টা বাস্তবতার সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনা নিয়ে খানিকটা আলাপ করবো আমাদের আশেপাশের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে।

বেশ্যা-পতিতা-ছিনাল-খানকি: নিত্য স্ত্রী-বাচক শব্দ।

বেশ্যা শব্দটি এসেছে বৈশ্য শব্দ থেকে। বর্ণপ্রথার কালে হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণীকে বলা হতো বৈশ্য। সেখান থেকে বিকোনো অর্থে এসেছে বাংলা বেশ্যা শব্দটি। কালের পরিক্রমায় শব্দটির একক-একমুখী অর্থ নির্মিত হয়েছে। শরীর বিক্রি করা মেয়েদের উপাধি হয়েছে বেশ্যা শব্দটি। সে যাই হোক, শুধু শরীর বিকোলেই না, সমাজে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করলে, পুরুষতান্ত্রিক অবদমনকে মেনে না নিলে, রাত-বিরোতে ঘোরাফেরা করলেও বেশ্যা বলার চল আছে। বেশ্যা একটি স্ত্রীবাচক শব্দ এবং এর কোনো পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ নেই। তারমানে কি এই যে, শরীরী শুদ্ধতা শুধুমাত্র নারীদের বিষয়? পুরুষের শরীর শুদ্ধ হতে হয় না? পুরুষের শরীর বিক্রয়যোগ্য কোনো পণ্য হতে পারে না? একই রকমের শব্দ ছিনাল/ছিনার। অভিধানে এগুলোর অর্থ করা আছে পতিতা, ভ্রষ্টা, কুলটা, ব্যাভিচারিণী, মিথ্যা প্রণয় মান অভিনয় ইত্যাদিতে কলাকুশলি নারী। খানকি শব্দের আভিধানিক অর্থ বারাঙ্গণা, বেশ্যা। পতিতা শব্দের অর্থ করা আছে বেশ্যা, বনিতা, বারবনিতা। এই শব্দগুলোর কোনোটিরই কোনো পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ নেই।

ভাত দেয়া ভাতার আর পুঁজিতান্ত্রিক দাস নারী

ভাতার শব্দের সরাসরি অর্থ করা আছে স্বামী , পতি এই দুটি শব্দ। এছাড়া ভরণ করায় যে, ভর্ত বা ভাত দেয় যে সেও ভাতার। আমাদের প্রমিত বাংলা ব্যবহারকারী মধ্যবিত্তের বাঙালি সংস্কৃতিতে ভাতার শব্দটির তেমন প্রচলন না থাকলেও নিম্নবিত্তের যাপন ক্রিয়ার সাথে ভাতার শব্দটির এখনও ওতোপ্রোত বসবাস। মধ্যবিত্ত নারীর ভাত কিংবা ভরণ-পোষণ এই যুগে এসে আর আগের মতো পতি কিংবা স্বামীর প্রতি নির্ভরশীল নেই। অনেকেই এখন কর্মক্ষেত্রে যায় এবং ইচ্ছে করলেই পুঁজিতন্ত্রের আওতায় স্বনির্ভর অর্থনৈতিক জীবন যাপনে সক্ষম। কিন্তু নিম্নবিত্তের নারীরা ঘরেই থাকেন বিশেষত। প্রতিদিন গৃহস্থালী নামের শব্দের মধ্যে একটু একটু করে হারিয়ে যেতে থাকে তার শ্রমিকতার ইতিহাস, হারিয়ে যেতে থাকে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তার বিনিয়োজিত শ্রমের মূল্য পাবার প্রশ্ন। স্বয়ং কার্ল মার্কসও টের পাননা। তাই পুরুষ এখনও নিম্নবিত্তের ভাতার। সবমিলিয়ে পুরুষ-পুঁজি আর পুরুষ-স্বামীর মিলিত প্রয়াসে ভাতার শব্দটির অভিধান স্বীকৃত হয়। নিম্নবিত্তের যে নারীরা গৃহস্থালীর বাইরে ইট ভাঙেন, গার্মেন্টস-এ কাজ করেন, অন্যের বাড়িতে দাসীর কাজ করেন, হায় তবু পুরুষ তাঁদেরও ভাতার।

সতীত্বের চিহ্ন: সতীত্বের পুরুষ-ভাষা

প্রথমে অভিধান থেকে কিছু শব্দের অর্থ আমরা জেনে নিতে পারি। বাংলা একাডেমীর অভিধানে এভাবে অর্থগুলো করা; সতী: সাধ্বী, পতিব্রতা, স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষে আসক্ত নয় এমন, হিন্দু পুরাণের দক্ষ কন্যা, শিবানী, স্বামীর মৃত্যুতে সহগামিনী স্ত্রী।

সতিচ্ছদঃ কুমারী ঝিলী, যোনিমুখের পাতলা পর্দা। সতীত্বঃ যৌন পবিত্রতা, সতী স্ত্রীর ধর্ম। সতী ধর্মঃ স্বামীর প্রতি নারীর একনিষ্ঠতা বা যৌন পবিত্রতা। সতীপনা/ সতীগিরিঃ সতীত্বের ভুয়া গর্ব বা মিথ্যা ভড়ং।

সতীত্ব তাহলে শুধুই নারীর বিষয়। সতীত্ব হলো যৌন পবিত্রতা, সোজা বাংলায় বললে একগামীতা, যা কেবল নারীর জন্যই অভিধানসিদ্ধ। কেননা পুরুষের জন্য সতীত্বের সমার্থক শব্দ আমি অন্তত ডিকশনারিতে খুঁজে পাইনি।

চুত, চুতমারানি, চুদ, চুদাঃ নারীর উপর ভাষিক-সহিংসতা

অভিধানে চুত শব্দের অর্থ করা আছে যোনি। চুতমারানিঃ যত্রতত্র যৌনসঙ্গম করে এমন। চুদঃ যৌনসঙ্গম। পাঠক খেয়াল করে দেখুন, চুদ শব্দের সমার্থক হিসেবে যৌনসঙ্গমের কথা বলা থাকলেও চুদা শব্দের সাথে একেবারে কর্তাসত্তা হিসেবে পুরুষের ভাবমূর্তি ভেসে ওঠে। সেই একমাত্র সক্রিয়ক হয়ে দাঁড়ায়। কোনো মেয়ে বলেনা যে, চুদব। কেন বলে না? কেননা চুদ শব্দের আভিধানিক অর্থ যৌনসঙ্গম হলেও অর্থের জগতে এখানে পুরুষেরই একক আধিপত্য। চুত শব্দের অর্থ যোনি। যৌন শব্দটিও যোনি থেকেই এসেছে। যোনিগত, যোনিজাত যা তাই যৌন। কিন্তু যৌনতা শুধুই নারীর যোনিতে থাকে, পুরুষ তাতে সাড়া দেয়, তারমানে কী দাঁড়ায়? আবারো নারীর অক্রিয় ভূমিকা। তার প্যাসিভ রোল। যৌনতায় তাঁর নিষ্ক্রিয়তা। [বলে রাখাটা অত্যন্ত সঙ্গত হবে যে, ভারতের একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধক, কলিম খান, যোনি-যৌনতার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বের করেছেন যা যৌন শব্দের একক অর্থকে অস্বীকার করেছে। সে অর্থে তিনি ভাষায় পুরুষাধিপত্যের বিরুদ্ধে আমাদের সাথে লড়াইয়ে আছেন।] এমনি করে 'গোয়া মারব' 'চুদব' এমনকি 'খাব' শব্দগুলির মতো অনেক অনেক শব্দ দিয়ে এই ভাষিক সহিংসতা জারি রাখা হয় যেখানে নারী বিবেচিত হয় পুরুষের যৌনভাবনা কিংবা যৌনক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে। যৌনতায় নারীর সক্রিয়তা থেকে তাকে বিযুক্ত রাখা হয়। শব্দগুলি নারীর উপর যৌনপীড়নের প্রতীকে পরিণত হয়। যৌনতা হয়ে দাঁড়ায় পুরুষের সক্রিয়তার এলাকা, নারী তাতে শুধুই নিপীড়িত, শুধুই অনুষঙ্গ।

ধর্ষণঃ নারীর উপর শারীরিক সহিংসতা

প্রথমে অভিধান থেকে অর্থ জেনে নিই। ধর্ষণ শব্দের অর্থ করা আছে পীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন, বলাৎকার, বলপূর্বক গ্রহণ। ধর্ষণী নামে একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যার অর্থ অসতী নারী। ধর্ষিত শব্দের অর্থ করা আছে উৎপীড়িত, অত্যাচারীত, পরাভূত, পরাজিত, অপমানিত, তিরস্কৃত আর ধর্ষিতা শব্দের অর্থ বলাৎকৃতা, বলপূর্বক সতীত্ব নষ্ট করা হয়েছে এমন। আবারও সেই একইভাবে দেখুন পাঠক, ধর্ষণ শব্দের অর্থ হিসেবে পীড়ন অত্যাচার নির্যাতন ও বলপূর্বক গ্রহণের কথা বলা থাকলেও ধর্ষণী নামের একটি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যার মানে করা আছে অসতী নারী, তারমানে আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক ভাষার জগতে কেউ ধর্ষণের শিকার হলে, কাউকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা

হলে তার সতীত্ব চলে যায়। ওদিকে আরেকটি শব্দ পেলাম ধর্ষণীয় যার অর্থ ধর্ষণযোগ্য, ধর্ষণসাধ্য, নির্যাতন বা দলন করতে পারা যায় এমন। তারমানে ধর্ষণযোগ্য কিংবা ধর্ষণসাধ্য বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব যদি থাকে তাহলে আমাদের এটা মেনে নিতে হয় যে, খোদ অভিধান ধর্ষণকে অনুমোদন করে! ধর্ষণযোগ্য কিংবা ধর্ষণসাধ্য কোনোকিছুর অস্তিত্ব রেখে। হায়রে সতীত্ব! হায়! এখানে ধর্ষিত শব্দের অর্থ হিসেবে কোথাও সতীত্বের প্রশ্নটি না তোলা হলেও ধর্ষিতা বলতে সেই মেয়েটির কথাই বলা হয়েছে যার সতীত্ব হরণ করা হয়েছে বলপূর্বক। তারমানে নারীর সতীত্ব তার নিজের কাছে না, সতীত্ব বন্দী পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার কাছে। জোর করেও কাউকে ধর্ষণ করবে পুরুষ আর নাম দেবে অসতী। নারীকে গ্রহণ করতে হবে সেই উপাধি।

লিঙ্গান্তরে অর্থান্তর: সতী, নটী, মাগী

লিঙ্গান্তরে অর্থেরও বদল ঘটেছে কিছু কিছু শব্দে। এই যেমন সতীর পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ সৎ হলেও সৎ শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে শরীরগত সততা, তথা সোজা বাংলায় বদলে একগামীতার কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি করে নটী শব্দের অর্থ হিসেবে নর্তকী, নৃত্য যে নারীর উপজীবিকা, অভিনেত্রী এইসব শব্দের কথা বলা আছে। কিন্তু নট শব্দটি অভিধানে থাকলেও বাইরে প্রচলন নেই। কিন্তু বেশ্যা, শরীরী, প্রণয়ী নারী অর্থে নটী শব্দের প্রচলন আছে বিশেষত নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে। মাগী শব্দের অর্থ করা আছে: প্রাপ্ত বয়স্কা, স্ত্রীলোক, সাবালিকা নারী, বেশ্যা, গণিকা। কিন্তু মরদ মানে: বেটাছেলে, যে ব্যক্তির পুরুযোচিত গুণ রয়েছে, শক্তিশালী ব্যক্তি, বীরপুরুষ, যুবক, পতি, স্বামী। পাঠক খেয়াল করে দেখুন মাগী শব্দের সাথে বেশ্যা/গণিকা শব্দের সমার্থ করা থাকলেও এর পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ মরদ-এর সাথে শারীরিক বেচা-কেনার কোনো সম্পর্ক নেই। তারমানে, ছেনাল-বেশ্যা শব্দের মতো এই শব্দগুলির অভ্যন্তরেও জারি আছে একই সেই ধারণা যে, একগামীতা, শারীরিক শুদ্ধতা, সতীত্ব এইসব শুধুই নারীর বিষয়। মানে নারী একগামী থাকবে, অনেকের সাথে শারীরিক সম্পর্ক থাকবে না, পুরুষ তাকে এই পুরুষতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী মালিকানার যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে ইচ্ছেমতোন ব্যবহার করবে, ভোগ করবে কিনে নেয়া সম্পত্তির মতো।

ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির লৈঙ্গিক অভিপ্রকাশ: আমারই পূর্বপুরুষ।

পুঁজিতান্ত্রিক-ব্যক্তিসম্পত্তির যুগে পূর্বপুরুষ নামের একটি শব্দ থাকলেও পূর্বনারী বলে অভিধানে কোনো শব্দ নেই। পূর্বপুরুষ শব্দটির আভিধানিক অর্থ বংশের পিতৃপিতামহাদি পূর্বগামী ব্যক্তিগণ। ওদিকে পুরুষানুক্রম নামে একটি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে অভিধানে যার অর্থ বংশপরম্পরা। তারমানে আমাদের পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার উপস্থিতি যে সম্পদের ধারণা জারি রেখেছে সেখানে নারীও পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং ভয়ঙ্করভাবে দৃশ্যমান হয় এই সত্য যে, ১০ মাস নিজের শরীরের মধ্যে আরেকটি শরীরকে একটু একটু করে বড় করে

তোলা, তাঁর অধিকাংশ দায়দায়িত্ব পালন করা, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার সাথে প্রথম অনুভূতির বিনিময় যে শিশুর, সে শিশুর পূর্বনারী নেই, সে শিশুর নেই কেনো নারীক্রম! সে শিশু কেবলই পুরুষের পরিচয়ে পরিচিত হয়। পাঠক, এই পূর্বপুরুষ আমাদের অস্বীকার প্রক্রিয়ার এক নাম। অবদমনের এক নাম। নারীর উপর পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যে আধিপত্য; এই পূর্বপুরুষ শব্দটি তারই প্রতিমা। একগামী নারীর জন্য, বংশপরিচয়ের নিমিত্তে, পুরুষের আইডেনটিটি বজায় রাখতেই এই প্রক্রিয়া। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য আর নারীর জন্য কাল-নির্ধারিত একগামীতার ধারণা মিলেমিশে তৈরি করে পূর্বপুরুষ।

শালা কখন গালি? কখন বন্ধু 'মামা'?

শালা শব্দের আভিধানিক অর্থ পাচ্ছি ২টি। স্ত্রীর ভাই আর গালিবিশেষ। স্ত্রীর ভাই আর গালি একই শব্দে প্রকাশিত। সামাজিক অর্থ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় একেবারে তুচ্ছার্থে গালি অর্থে এই শালা শব্দটির ব্যবহার এবং স্ত্রীর সাথে তাঁর সম্পর্কসূত্র পুরাষাধিপত্যের ভয়ঙ্কর নমুনা। স্ত্রীর ভাই, শালা, একেবারে তুচ্ছ, হাস্যরসের উপাদান ইত্যাদি। এমনি করে তরুণ প্রজন্মের একটি অংশের মধ্যে বন্ধুদের পরস্পরকে আর শালা নয়, মামা নামে ডাকা হচ্ছে। শব্দটি কিন্তু শালার বিপরীতে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং এখানেও ব্যাপারটা হলো বাপের শালা বলে উপহাস করা। আমরা টেরই পাই না, এভাবে গোপনে কখন পুরুষাধিপত্যশীল শব্দ আমাদের মাঝে ঢুকে যায়।

মেয়েলি মানে কী? পুরুষালি মানে কী?

অভিধানে মেয়েলি আর পুরুষালি শব্দের অর্থের মধ্যে দিয়ে নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত ভিন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক অর্থ নির্মাণে মেয়েলি শব্দটি দিয়ে মেয়েদের আবেগী, যুক্তিহীন, কোমল প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য জানান দেয়া হয়, অপরদিকে পুরুষালি শব্দটি দিয়ে পৌরুষ, শক্তি, ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। এখানেই ভাষার রাজনীতি। তারমানে মেয়েরা আবেগ নিয়ে থাকবে, কোমল হবে, কোনো উল্টোপাল্টা করবে না, পুরুষত্বসম্পন্ন পুরুষের অধীনস্ত থাকবে। এই হলো সোজা বাংলা কথা। তাই আমরা যখন দেখি কোনো ছেলে কোমল আচরণ করছে কিংবা তেমন কিছু করছে তখন তাঁর স্বভাবকে মেয়েলি স্বভাব বলে উপহাস করা হয়। আবার অপরদিকে মেয়েরা যদি বাইরে চলাফেরা করে, তর্ক করে, জোড়ে হাঁটে, সোজা কথায় পুরুষতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে তখন তার স্বভাবকে পুরুষালি স্বভাব বলে গালি দেয়া হয়।

নপুংসক: পুরুষেরই গালি

নপুংসক শব্দটিও পুরুষাধিপত্যেরই অর্থ বহন করে। নপুংসক শব্দটির মানে করা আছে ক্লীব, হিজড়া, স্ত্রীও নয় পুরুষও নয় এমন মানুষ, ছিন্নমুষ্ক, খোজা, পুরুষত্বহীন, বীর্যহীন,

কাপুরুষ, পৌরুষের অভাব, ব্যক্তিত্বহীন। অর্থাৎ দেখুন পাঠক; পুরুষত্বহীনতা, বীর্যহীনতা আর যৌনসক্ষমতা থাকা না থাকা একই শব্দ দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। পৌরুষের অভাব কিংবা পুরুষত্বহীন- এই দুটি শব্দেও যখন নপুংসক-এর সমার্থক বিবেচনা করা হয়, তখন এই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া আমাদের বুঝতে শেখায়, আসলে মনুষ্য প্রজাতির সমগ্র থেকে সমস্ত পুরুষ আলাদা এই অর্থে যে তার যৌনক্ষমতা নারী-হিজড়া সবার থেকে আলাদা, অনন্য। এই শ্রেষ্ঠত্বের বোধ এই অধিপতি পুরুষ-মন আর অধিপতি পুরুষভাষা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

গৃহিণীপনা: ভাষা যখন গৃহকর্মে নারীর একক দায়িত্বকে প্রশ্নাতীত করে

অভিধানে গৃহিণীপনার মানে করা আছে: গৃহিণীর দায়িত্ব পালনে দক্ষতা। আরেকটি মানে আছে বাংলা একাডেমীর অভিধানে। সেটি হলো: গৃহিণীর আচরণ। কিন্তু গৃহের কাজে নিয়োজিত পুরুষকে প্রকাশ করতে অর্থপূর্ণ কেনো শব্দের হদিস অভিধানে পাওয়া যায়নি, আমি অন্তত পাইনি। তারমানে পাঠক, গৃহের কাজকে নারীর একক কাজ বলে বিবেচিত করা হয় বলেই গৃহিণীপনার মতো শব্দগুলো অভিধানে থেকে যায়। যা প্রশ্নাতীত করে এই পুরুষতান্ত্রিক-বাস্তব যে, গৃহের কাজের দায়িত্ব একান্তই নারীর। পুরুষের না। আর এমনি করে নারীকে গৃহ-বন্দী রাখবার বাস্তবতা প্রবহমান থাকে, যদিও মেয়েরা এখন বাইরে যায়, কাজ করে, তবুও গৃহের একক দায়িত্ব থেকে তার মুক্তি ঘটবার নজির আমাদের চেখের সামনে আসে না বললেই চলে।

মানেটা দাঁড়ালো কী? আমরা যতোগুলো শব্দের মানে দেখেছি এবং বিশ্লেষণ করেছি তা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ভাষার গড়নটা পুরুষতান্ত্রিক, পুঁজি-প্রেষিত পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞান-ক্ষমতা-সম্পর্কের কারণে। প্রাক-পুঁজিবাদী দাস নারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে। পুঁজিবাদ সস্তা শ্রমের লোভে অন্দরের নারীকে বের করে বানিয়েছে গার্মেন্টস-এর শ্রমিক। শুধু রাজার অন্দরের নর্তকীকেই নয়, আরও আরও অনেক মেয়েকে পরিণত করেছে পুরুষতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষিতায়। যে পুরুষতান্ত্রিক ভাষিক আধিপত্য ছিনালপনা আর সতীত্বের মাঝে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে দিয়ে সম্ভ্রমের ফ্রেমে নারীকে বন্দী রাখে, তাকে ভোগ্য বানায়, তাকে পুঁজিবাদী পুরুষ আর পণ্যের মডেল বানায় (এইযুগ নারীকে শুধু পণ্যের নয়, খোদ পুরুষতন্ত্রেরই মডেল বানিয়ে ছাড়ে। নেশা নয়, শুধুমাত্র ছেলেরা খায় বলে সিগারেট খাওয়াটা জরুরি হয়ে ওঠে মেয়েদের জন্য, যখন স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা সৌন্দর্য্য নয়, শুধুমাত্র ছেলেদের পোশাক বলে জিন্স আর ফতুয়া মেয়েদের পোশাক হয়ে যায়, তখন নারী খোদ পুরুষতন্ত্রেরই মডেল হয়ে যায়।); একই সেই পুঁজিবাদী পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যই তার সম্ভ্রমহানী ঘটায়। তার ওড়না টেনে নেয়, তাকে ধর্ষণ করে, তার মুখে এসিড ছুঁড়ে দেয়। সঙ্গমের নামে তাকে পীড়ন করতে থাকে। তারমানে পাঠক, নারীর উপর বল প্রয়োগের শর্তগুলো সেই ভাষার মাধ্যমেই জারি রাখা আছে, যে ভাষা তাকে সতীত্ব আর সম্ভ্রমের ফ্রেমে বেধে রেখেছে। সম্ভ্রম আছে বলেই শ্লীলতাহানী আছে, ধর্ষণ আছে বলেই আছে

ধর্ষণযোগ্য। সতীত্ব আছে বলেই আছে বেশ্যার একমুখী অর্থের অস্তিত্ব। পুরুষতন্ত্র নারীকে তাঁর যৌনতার স্বাধীনতা, তাঁর মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তাঁর অর্থনৈতিক স্বীকৃতি, তাঁর রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য, কবিতা লেখা কিংবা অন্য যেকোনো সাংস্কৃতিক তৎপরতার স্বাধীনতা থেকে দূরে রেখে তার উপর যে কর্তৃত্ব কায়েম করেছে আমাদের ভাষা তারই বাহন। এই ভাষার মধ্যে জারি থাকা পুরুষতান্ত্রিক-সংস্কৃতির চিহ্নগুলো আস্তে আস্তে মুছে ফেলতে না পারলে আমাদের পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ শুধুমাত্র লৈঙ্গিক-ভিন্নতার কারণে তাদের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবে। ক্ষুণ্ণ হবে তার শারীরিক-মানসিক প্রতিটি চাহিদা, প্রতিটি মানবিক প্রাপ্তির অধিকার। তারপর যৌনতাকে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুরুষেরা নারীদের খেয়ে ফেলবে ভাষায় এবং বাস্তবে। ভাষা পুরুষ দিয়ে নারী চোদাবে বাক্যে-ভাবনায়-সাহিত্যে-সঙ্গীতে, আর পুরুষতান্ত্রিক মালিকানার ক্ষমতাবৃত্ত তার সফল বাস্তবায়ন ঘটাবে কাজে। পূর্বপুরুষ শব্দের মধ্যে আড়াল করবে মনুষ্যপ্রজাতির হয়ে উঠবার অনন্য ইতিহাস। 'গৃহীণিপনা' নামের ভাষা আড়াল করবে তার অর্থনৈতিক অবদান, অর্থশাস্ত্রের বাইরে থেকে যাবে নারীর শ্রমের মূল্যের প্রশ্ন। রাজনীতিতে জিয়া-মুজিবের পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের প্রতীক দুই উপাধি দেখেছেন পাঠক। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নামের আগে শেখ এবং নামের শেষে ওয়াজেদ নিয়ে তারপর ক্ষমতায় আসেন। বাপ-স্বামী দুজন। পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার দুই মূর্ত প্রতীক। তারেকের নামের শেষে থেকে জিয়া তুলে দিয়ে তাঁকে তারেক রহমান বানানোর দৃশ্যমান কারণটিও কি ঐ পুরুষতান্ত্রিক প্রতীককে ধরে রাখবার প্রচেষ্টা নয়? পাঠক খেয়াল করে দেখবেন কি, রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের সময় খালেদা-পুত্র তারেক জিয়া নামে মিডিয়ায় এবং ব্যক্তিগত আলাপে আলোচিত হলেও পরবর্তীতে তিনি বনে যান তারেক রহমান। এর ভেতরে কি এই রাজনীতি ছিলো যে খালেদা জিয়ার নামের শেষাংশ থেকে জিয়া নিলে মাতৃকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়? কিন্তু হায়রে হতভাগা পুরুষতন্ত্র! খেয়াল করতে তার বাকি থেকে যায়, জিয়া-পত্নীও জিয়ার নামকেই বিবেচ্য করেছেন। হয়েছেন খালেদা জিয়া!

আমাদের সমাজতত্ত্বও নতুন ভাষা খুঁজে বের করুক। নৃ-বিজ্ঞানের মাঠে মাতৃতান্ত্রিকতার উৎস খোঁজার চেষ্টা জোড়ালো হয়েছে। প্রতিবেশ নারীবাদীরা নারীর উপর আধিপত্যের সাথে প্রকৃতির উপর আধিপত্যকে মিলিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছেন। নারীবাদের জমিনেও যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন সংকল্প। সংকল্প তৈরি হয়েছে বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে। কর্পোরেট মিডিয়ার পুরুষতান্ত্রিক চরিত্র তার ভাষায় (এখনকার পত্রিকাগুলোর কেউ কেউ ঘোষণা দিয়ে জেন্ডার কনশাসনেস জারি রাখবার কথা বলে, সেটা মনে রেখে এবং পরীক্ষা করে দেখেও জোড়ালোভাবে চ্যালেঞ্জ রেখে বলছি) এবং প্রতীকে এবং অর্থ নির্মাণে সর্বোপরি রিপ্রেজেন্টেশনে প্রবলভাবে বহাল থাকলেও নয়া যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের সামনে এনেছে নতুন দিনের ইশারা। আমি ফেইসবুকের কথা বলছি। ব্লগের কথা বলছি। বলছি অপরাপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কথা। পুঁজির উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে বাজার-বিজ্ঞাপনের স্বার্থে গড়ে উঠলেও এইসব মাধ্যম হয়ে

উঠেছে প্রতিরোধী মানুষের মিলিত হবার, প্রকাশিত হবার এক অনন্য মাধ্যম। অ্যাকসেস করতে পুঁজির খবরদারি মানতে হয় না বলেই এখানে জুটে গেছে যত্তোসব প্রতিরোধী মানুষ। জানিয়ে দিচ্ছে তাদের অধিকারের কথা। আর তাই মহিলা কবির অপবাদ ঘুচিয়ে প্রবলভাবে মেয়েরা কবিতা লিখছে। এটাই একমাত্র প্রতিরোধ নয়। আমি বলছি একটি সাইনের কথা। হুম পাঠক, মেয়েরা কবিতা লিখতে শুরু করলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে এমন একটা অনুমান আমার হয়েছিলো বহু আগেই। আজ দেখতে পাচ্ছি, ছোট পরিসরে হলেও সেটা সম্ভব হয়ে উঠেছে। অগ্রজ বন্ধু ফাতেমা শুভ্রা লিখেছেন:

> আমার শরীরের অনেক অঙ্গ/ প্রায়ই হারিয়ে যায়/ কেউ কেউ ফিরে আসে/ কেউ আসে না.../ সেদিন বনের কাঠ কুড়োতে/যে মেয়েগুলো গেলো../ ফিরে এসে বলে আমায়/ আমার যোনিকে তারা/ হলুদ প্রজাপতি হয়ে/ উড়ে যেতে দেখেছে।/ ...কবিতা শুনে কেউ কেউ প্রশ্ন করে../ "আচ্ছা কবিতা এতো শরীরী কেন?"/ "কেন হবে না/ আমাদের শরীর নিয়েই তো চলে বেশ মাতামাতি../ চিকিৎসা বিজ্ঞানের রয়েছে আমাদের শরীর নিয়ে আলাদা ক্ষেত্র../ গাইনোকলজি..."/ বন্ধুমানুষ প্রশ্ন করে.."এর চাইতে ভিন্ন ভাষা তৈরি করতে পেরেছো কী?"/ হলুদ প্রজাপতির মতো উত্তর দেই/ "মনে হয় পেরেছি, মানুষ আমাদের এখন অশ্লীল বলে!" [হলুদ প্রজাপতি...]

ফাতেমা শুভ্রা পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞান-ক্ষমতা-ডিসকোর্সে নির্মিত বাংলা কবিতার শরীরে এক ভয়ঙ্কর আঘাত হেনে দিলেন। কবিতার অনুষঙ্গ থেকে নারী হয়ে উঠলো কবিতার কর্তাসত্তা। এমন দোর্দান্ত আবির্ভাব আরও লক্ষ করেছি মনিকা রশিদের কবিতায়। মনিকাদি'র দেশ-বিষাদ বেদনা-প্রেম-একাকীত্ব-স্বপ্ন একান্তই নারীর কণ্ঠস্বর হয়ে আমার কাছে আসে সাইবার স্পেসের মুক্ত জমিনে ভেসে ভেসে। নারীর নিজস্বতা, তাঁর একান্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় মনিকার কবিতায়। লিখে ফেলেছেন মনিকা রশিদ:

> কোজাগরী পূর্ণিমায়/ ঠাকুমা বিষাদ মুখ বেয়ে/ শব্দ ঝড় নেমেছিলো-,"এ দেখি আবার ও এক মেয়ে!"/ আতুর বেড়ার ফাঁকে/ বাবার চিবুকে চোরা সুখ–/ "মেয়ে দেখি চন্দ্রাবতী–! তোমার মুখের মতো মুখ!"/ বড় হ্ও বেড়ে ওঠো/ অবহেলা সয়ে নিতে শেখো।/ একদা আকাশে চুল– পা দুখানি কাদাজলে মেখো।/ মাটিরে আদর দিয়ে/ বর্ষা জলে বেঁধে নিও বীজ/ অংকুরের সময় এলে– সে কিশোর ছিঁড়বে কামিজ।/ শাড়ি নিও, শাড়ি দিয়ে/ ঢেকে রেখো শরীর, সে মন/ পাছে পুঁথি জেনে যায়– আড়ালের সে কী আয়োজন!/ আড়ালেই গল্প রেখো/ তা না হলে জানবে সে ছেলে,/ এমন অপাঠ্য তুমি– আলো উড়ে যায় ডানা মেলে!/ আলো গেলে রাত আসে,/ রাত এলে আত্মপরিচয়/ আত্মাকে নির্লিপ্ত করে– একবাটি বেদনা শুধায়! [চন্দ্রাবতী-১]

ওদিকে আরেক প্রবাসী কবি চিমটি খান, মুগ্ধ করে দিয়েছেন ভিন্ন ভাষার শক্তিতে। আপন মহিমায় ভাস্বর এই তরুণ কবির প্রতি লাল সেলাম। শুনুন তাঁর একান্তভাষ্য:

সুখে সুখে আর একবার স্বপ্নের চাবি ভাঙলাম/ দেহ থেকে কঙ্কাল মোমের মতো গলে গলে/ উড়ে উড়ে জেনে গেল আলোকবর্ষ দূর কষ্ট/ আমি জানলাম–/ আমার মিথ্যা শীৎকার শুনতে চেয়ে চিৎকার করে গেল/ রাক্ষুসী অন্ধকার, বাতাস পাশ ফিরে কী সুন্দর নির্জন– /পাখিরা জোৎস্নায় পালক ডুবিয়ে ঘুমাচ্ছো? আসো দেয়াশলাইয়ের কাঠিতে চুমু খাই, একটু/ কমলা লিপিস্টিক মেখে মেখে ঝরা পাতায়/ আগুন জ্বালাই–/ ইলিশের নাভীতে মানুষের লালা ধূর্ত সঙ্গম শেখায়/ ভুলে যায় জ্যোৎস্নায় চুমুর জোয়ার/ মানুষের কাছে এসে মাছেরাও/ সঙ্গমের সুখ আর মেঘের কৌটায় তুলে রাখেনা/ উদভ্রান্ত লাল শাক গৃহিণীর কাটা আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে/ রক্তের রঙ নিয়ে ভাবতে ভাবতে রক্ত হয়ে যায়/ ভুলের পোকামাকড় খুব ভালো বোঝে শিকড় আসলে/ নান্দনিক কিছু বিন্যাস, জীবনের কেউ নয়/ তারপরও আবার খুব নিজস্ব রাত্রি কাছে এলে/ শাড়ির সঙ্গে আড়ি পেতে প্রিয় অন্ধকার আমি গায়ে জড়াবো/ সুখের ব্যাক্টেরিয়ার কানে কানে বলে দেব আমি আসক্ত– / পতনোন্মুখ প্রেম, আমাকে উজাড় করো [পতনোন্মুখ প্রেম]

বন্ধু তানজিনা ফেরদৌস তাইসিন লিখেছেন ব্যাকুল বন্ধুবিষাদ। পিতৃতন্ত্র-মালিকানা-সম্পর্কের এক সহজ সমীকরণ কিন্তু এতো জোড়ালোভাবে কবিতায় উঠে আসে! লিখেছেন তানজিনা:

ও মেয়ে! তোর বন্ধু বুঝি হয়?/ বেশতো ছেলে, চালতা পেরে দেয়!/ অ্যাত্তো মায়া কই থেকে ওর আসে?/ ওই ছেলেটা বড্ড ভালোবাসে!/ তোর দুখেতে আকুল হয়ে কাঁদে,/ লাল ঘুড়ি আর নীলচে চুড়ি সাঁধে।/ তোর সুখেতে নিখাঁদ খুশি হয়,/ ও আছে তো! তোর কীসের আর ভয়?/ ও ছেলে খুব বন্ধু বুঝি তোর?/ দু'জন তোরা ঠিক যে মানিকজোড়!/ সেতো আমার বন্ধু নাইকো আর!/ বন্ধু না থাক, শত্রু চমৎকার.../ কী ছাই বলিস, সেও কখনও হয়?/ বন্ধু না থাক, শুভার্থী নিশ্চয়!/ শুভার্থী না, সত্যি শত্রু হয়!/ আমার সকল অনিষ্ট সে চায়।/ কেমন করে এমন হলো বল?/ প্রাণের সখা কেমনে হয় রে খল?/ 'পুরুষ' যখন বন্ধু হতেও যায়/ বন্ধু যাহোক, 'পুরুষ' বেশি রয়,/ সে বন্ধুত্ব এমনি করেই বাড়ে/ নারীর উপর 'পুরুষ অধিকারে'।/ যেটুক সময় নিজস্ব সম্পদ/ সে সময়ই থাকবে মহব্বত।/ একটু যদি পান থেকে চুন খসে–/ কিংবা হয়তো নেই তুমি তার বশে,/ সেই সময়ই দেখবে আসল রূপ,/ সে কিছুতেই থাকবে না নিশ্চুপ।/ এমন কাণ্ড 'পুরুষ' হলেই ঘটে/ দেখবে কতো নিন্দা মন্দ জোটে।/ 'পুরুষ' বাবা-প্রেমিক-স্বামীর মতো/ ঘেন্না করি 'পুরুষ' বন্ধু যতো। [ব্যাকুল বন্ধুবিষাদ]

মাহি ফ্লোরা লিখলেন:

ধারাবাহিক কান্নায় উত্তাল নগর যদি চায়, এখনি তুমি নিষ্ঠুর নীরবতায় ভিজবে.../ বাসি বৃষ্টির দাগ মুছে পেন্সিল কাঠের নিদাঘ ভুলো ফার্নিচারে হাত-পা ছড়িয়ে যদি থাকো,/তবে ভালোবাসতেও পারি.../ যতটা ভালোবেসে রচিত হয় মহাকাব্য, মিথলজির আত্মা../ গুনগুন কান্নায় অন্ধের অক্ষর খুঁজে ফেরে জেটি,/ থামতে হবে, নামতে হবে.../ বড় বেশি পরিষ্কার সমাধান../ পৃথিবীর সব জীব সঙ্গম চায়,

> ভবিষ্যতে অতীত আনতে।/ এত ভাবছো বলেই, ভালোবাসতেও পারি।/ যতটা ভালোবেসে জরায়ু ভরে যায় পৃথিবীতে আরেকজন তুমির বীজে।/ জন্ম হয় নতুন তুমির...

কবিতার পুরুষতান্ত্রিক ডিসকোর্সকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন এঁরা। 'ডাকীনী' 'বাঘীনি', 'সুন্দরী', 'রাক্ষসী'রা এবার নিজেই কবিতা লিখতে শুরু করেছে। পুরুষের কাছে ধার করে নয়, একেবারে নিজের/নিজেদের ভাষায়। লিখেছেন আরও অনেকে। ছবি আঁকছেন। বিভিন্নভাবে দাপুটে ভাষার ভিত্তি নড়িয়ে দিচ্ছেন। যাদের আমি হয়তো চিনি না। জানি না। কিন্তু জানি আমি, প্রতিরোধ হচ্ছে। এই প্রতিরোধ আরও আরও জোরালো হোক। আমাদের দরকার নতুন অভিধান। যা আমাদের পথ দেখাবে নতুন অর্থ নির্মাণের। আমি জানি না, এই শব্দগুলোর পাল্টা শব্দ দরকার নাকি শব্দগুলোর অর্থ বদলে দেয়া দরকার। জানি না সংস্কৃতির সাথে এই পরিবর্তনের সম্পর্কটা কেমন দাঁড়াবে। আসলে ঠেকে ঠেকে আমাদের শিখতে হবে। যেক্ষেত্রে যেটা ভালো মনে হয়, সবার সম্মতি নিয়ে সেটা করাই দরকার। এই কাজে বিশেষজ্ঞ মতামত নয়, অনেক অনেক মানুষের গণতান্ত্রিক ঐকমত্য দরকার। সম্প্রতি বাংলাদেশের তরুণ লেখকদের উপর ভয়ঙ্করভাবে নেমে এসেছে নিষেধের বেড়াজাল। দেশের তরুণ লেখকদের একাংশ প্রমিত বাংলাকে অস্বীকার করে লিখে যাচ্ছেন নিজেদের আত্মপরিচয়ের সাথে জড়িয়ে থাকার দাবিসম্বলিত এক ভাষায়। মানুষের মুখে মুখে যে ভাষা পুষ্টি পেয়েছে সেই ভাষাকেই তারা সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। ভয়ঙ্কর কথা হলো, শোনা যাচ্ছে বাংলা একাডেমী নাকি আইন করবে। তরুণ কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা বাংলা ক্রিয়াপদ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করেন তাদের এবার রাষ্ট্রীয় শাসনের বেড়াজালে বন্দী করা হবে; আধুনিক নিও লিবারাল যুগে এরই নামতো আইনের শাসন! ভাষার দাবি যে জাতির জাতিগত মুক্তির প্রশ্নকে সামনে এনেছিলো, সেই জাতি বাংলাদেশ নামে একটি জাতিরাষ্ট্র বানিয়ে সেখানে স্বাধীনভাবে সৃজনশীল বাংলা ভাষা চর্চাকে ঠেকাতে আইন বানাচ্ছে আজ-- এই ইতিহাসটুকু টুকে না রাখলে জাতিরাষ্ট্র আর এই যুগের ক্ষমতাশক্তিকে চিনে নিতে আমাদের দেরি হয়ে যাবে। সে অন্য কথা। এদের কথা বললাম এই কারণে যে ভাষার আধিপত্য শুধু পুরুষতান্ত্রিক নয় কিন্তু, শ্রেণীগতও বটে। তুচ্ছ অর্থে তুই, সম্মান অর্থে আপনি, প্রভু অর্থে স্যার। গালি অর্থে ছোটলোক! ভাষায় পুরুষতান্ত্রিকতার মতো করেই ছড়িয়ে আছে শ্রেণীগত আধিপত্য, ভাষার পরতে পরতে। আছে অঞ্চলগত আধিপত্য। উপনিবেশের ইংরেজি। আমাদের পরিসরে ঢাকাইয়া (এই ঢাকাইয়া ঢাকার সেই আদি ভাষা নয়, যাইতাছি, খাইতাছি এই ভাষা) আধিপত্যও দেখা যায় প্রবলভাবে। ঢাকার নির্মিত শ্রেষ্ঠত্ব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে, বিশেষত মধ্যবিত্তকে ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলতে তাড়িত করে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা ভয়ঙ্করভাবে খেয়াল করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি যে, ঢাকার কিংবা কেন্দ্রের, কিংবা রাজধানীর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাই এই ভাষিক-প্রক্রিয়ার আদি।

সমস্ত আধিপত্যের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা লড়াই জারি আছে, তা জোড়ালো হোক। কোথাও না কেথাও এসে ভাষিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সামগ্রিক আন্দোলন একটি মিলনবিন্দুতে পৌঁছাবে। সেটাই কি হবে মুক্তভাষা! নোম চমস্কির উপর ভর করে বলি। প্রতিটি মানুষ অসীম সংখ্যক নতুন নতুন বাক্য তৈরিতে সক্ষম। ভাষা মানুষের আচরণের অন্তর্গত নয় বরং তা মানুষের সহজাত সক্ষমতা; তার অন্তর্জাত। চমস্কি মানবসত্তার একেবারে শাসের ভেতর জারি থাকা ভাষা-ক্ষমতার উপরে ভর করে বের করেছেন বাক্যের ডিপ স্ট্রাকচার। অনুমান; সব ভাষার ক্ষেত্রেই এই স্ট্রাকচার এক। এখান থেকেই সম্ভাবনা তৈরি হয় মনুষ্য-ভাষার একেবারে অভিন্ন সূত্রটি আবিস্কার করে ফেলার। প্রাচ্যে আছেন আমাদের কলিম খান। বাক্য নয়, চমস্কিকে সাথে নিয়েই উনি চলে গেছেন আরও দূরে। খুঁজে বের করেছেন ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি। শব্দের বৈচিত্র্যময় অর্থ; আর প্রতীকের সাথে সেই অর্থের সম্পর্কসূত্র। এরা সবাই নতুন ভাষা নির্মাণে আমাদের সাথে থাকবেন। সাথে থাকবে উপনিবেশিকতা-মুক্ত, শ্রেণীগত-আধিপত্যমুক্ত ভাষার দাবিতে যারা লড়াইয়ে আছেন সেই তারাও। চমস্কি ভাষাকে সম্পৃক্ত করেছেন মানবীয়তার সাথে। যাবতীয় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা আর আধিপত্যের বাইরে এসে ভাষা মানবীয়তার গান করুক। লৈঙ্গিক আধিপত্য-সহ যাবতীয় আধিপত্যের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ভাষা যথার্থই হয়ে উঠুক স্বাধীনতা! নৃবিজ্ঞান থেকে কবিতা পর্যন্ত সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইশারা দিচ্ছেন নারীরা, আশাবাদ তাই দৃঢ় হতে থাকে!

শেষের কথা:

১. সমস্ত শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানকে ব্যবহার করা হয়েছে এই বিবেচনায় যে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের আভিধানিক কর্তৃপক্ষ হলো বাংলা একাডেমী। তাই অর্থ-সংস্কৃতি যাবতীয় বিবেচনায় এই অভিধানই একমাত্র বিবেচ্য হয়েছে।

২. যাদের হুবহু কবিতাগুলো ফেইসবুক থেকে তুলে দিয়েছি তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধুজন। কিন্তু আলাদা করে এই লেখায় তাঁদের কবিতা ব্যবহার করার জন্য কোনে অনুমতি নেবার প্রয়োজন মনে করিনি যদিও হুবহু তাদের কবিতাগুলো উদ্ধৃত করেছি আমি। মুখচ্ছবি থেকে (ফেইসবুক শব্দের আপাতত এমন বাংলা করেছি আমি, তবে সন্তুষ্ট হতে পারিনি, বন্ধুদের কাছে আহ্বান থাকলো এর থেকে ভালো কোনো বাংলা পরিভাষা মাথায় আসলে সেটা আমায় জানাতে) কবিতাগুলো নিয়েছি, প্রত্যেকটা কবিতায় আমাকে ট্যাগ করা ছিলো সম্ভবত, না থাকলেও ক্ষতি নেই। মুখচ্ছবি আদতে কপিলেফট।

৩. আমি নিজে পুরুষ (সামাজিক অর্থে) এবং পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে বিরাজ করি। নিজে এমন প্রবন্ধ লিখছি বলে আমার ভাষা যে পুরুষাধিপত্য থেকে পুরোপুরি মুক্ত এমন দাবি আমি কখনও করছি না বরং আমার ভাষায় বিরাজিত পুরুষতন্ত্রকে আমি আমলে নিতে চাই, অতিক্রম করতে চাই। সেই বিবেচনায় এই প্রবন্ধ পড়েও কারও কাছে কোথাও যদি পুরুষাধিপত্যের চিহ্ন দৃশ্যমান হয় তাহলে সেটা দেখিয়ে দিলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

নারী ও প্রগতি; ২০০৯

ব্যান কালচার এবং সেক্যুলার রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চেহারা...

সরকার ফেইসবুক বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছে। এবং বন্ধ করে দিয়েছেও বটে। আমরা যারা এখন এটা ব্যবহার করছি, তারা কোনো রকমে প্রযুক্তির মুক্ত চলাচলের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল বন্ধুদের কাছে থেকে সাহায্য নিয়ে এখানে ঢুকতে পারছি। তাদের প্রতি আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। এবং বিনীত অনুরোধ, এই পথ-পদ্ধতিগুলো যতোখানি যেভাবে পারা যায়, ছড়িয়ে দিন। ইন্টারনেট নামের এই অভাবনীয় আবিষ্কারের প্রাযুক্তিক বৈশিষ্ট্যই গণতান্ত্রিক। একে ব্যবহার করবার সুযোগগুলো সম্পর্কে আপনারা আমাদের সবাইকে রাস্তা দেখান। যে যেভাবে পারেন। যতোটা পারেন।

ফেইসবুক বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। ব্যান করেছে 'সাময়িকভাবে'। ব্যান করেছে দুই তৃতীয়াংশের বেশী আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসা 'গণতান্ত্রিক' মহাজোট সরকার। সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে: এর পেছনের কারণ ধর্মীয় অনুভূতি, পেছনের কারণ শেখ হাসিনা-খালেদা জিয়ার ব্যাঙ্গাত্মক ছবি ফেইসবুকে উপস্থাপন। এবং খবরে প্রকাশ, যতোদিন পর্যন্ত ঐ সাব লিঙ্কগুলো দিয়ে প্রচারিত প্রকাশিত ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুনগুলো কিংবা এমন ধরনের জিনিসগুলো সরানো না যাবে ততোদিন ফেইসবুক বন্ধ থাকবে।

আমার প্রশ্ন:

১. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যঙ্গ নাজায়েজ হবে কেন?

২. ধর্মীয় অনুভূতিতে আমি আঘাত করিনি, আমার ফেইসবুক ব্যবহার বন্ধ হবে কেন?

৩. ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত পাওয়া-না পাওয়ার প্রশ্নে ফেইসবুকের একটা নিজস্ব অবস্থান আছে, তাকে রিপোর্ট করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। আমাদের কেন এই বিপত্তির মধ্যে ফেলা হলো?

৪. সামাজিক যোগযোগের মাধ্যম হিসেবে ফেইসবুককে ব্যবহার করবার অধিকার থেকে আমাকে প্রকাশ্যে বঞ্চিত করা হলো এবং কবে আমি আমার অধিকার ফেরত পাবো সেটাও বলা হলো না। 'যতোদিন' 'ততোদিন' কোনো নির্দিষ্টতা হাজির করে না।

৫. সেক্যুলার সরকার আর ডিজিটাল বাংলাদেশের সরকারের সাথে এই ঘটনার সম্পর্কসূত্রের জায়গাটা কী?

বন্ধুরা, সরকারের এই সিদ্ধান্ত ফ্যাসিস্ট সিদ্ধান্ত। এরই নাম নিও লিবারাল বাজার গণতন্ত্র। তত্ত্বে আর বাস্তবতায় যোজন যোজন ফারাক। এরই নাম রাষ্ট্র! রাষ্ট্র, আমার স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র। আমার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা। যে ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানুষে মানুষে যোগযোগ, কথা চালাচালি আর বন্ধুতা বন্ধ করে দেবার মাধ্যমেও। রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতা পয়দা করে। রাষ্ট্র মানুষে মানুষে ঐক্যকে ঘেন্না করে, ভয় পায়। রাষ্ট্র

আমার/আমাদের মানবিক সম্পর্কের মধ্যে কাঁটাতার আর বন্দুকের নল তাক করে। ফেইসবুক ব্যান করে দেবার ঘটনাটা তারই জ্বলজ্যান্ত নজির।

ফেইসবুক ব্যান করবার বিরুদ্ধে তাই আমাদের সরব প্রতিবাদ দরকার। প্রতিবাদ জারি না থাকলে রাষ্ট্র ক্রমাগত বেশি করে নিপীড়ক হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠে। ক্রমাগত চেপে বসে। প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ-ই তাই একমাত্র আশা। একমাত্র ভরসা।

আমি জানি না, আজ এই নোট দেখে আমাকেও র‍্যাব এসে মধ্যরাত্রে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাবে কিনা। আপনি পড়ছেন বলে আপনাকেও ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে কিনা। কিন্তু এভাবে পারা যায় না। সেনা কর্পোরেট কর্তৃত্বের জরুরি ক্ষমতার সেই ১/১১ সরকারের বিরুদ্ধেও এদেশের ছাত্র-জনতা লড়াই করে বিজয়ী হয়েছে। তাদের বিজয় ছিনতাই করে যে মহাজোট ক্ষমতায় এসেছে তারা বিষয়টি অনুধাবন করলে ভালো। না করলে আবারও প্রতিবাদে-প্রতিরোধে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে বাংলাদেশ। আমি আছি সেই প্রতিবাদে। বন্ধুরা, আপনারাও নিশ্চয় আছেন?

ফেইসবুক; ২০১১

নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র আর বন্ধ মঙ্গলধ্বনি

"I may disagree of what you say, but I will defend to the death - your right to say it." – Voltaire

মঙ্গলধ্বনি একটি অনলাইন মিডিয়া। তার ব্যানারে লেখা প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশের পক্ষে! সেই মিডিয়াটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বন্ধ করে দিয়েছে রাষ্ট্র। 'অপরাধ' বলা হয়নি, কোনো কিছু জানানো হয়নি, স্রেফ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র বন্ধ করে দিয়েছে মঙ্গলের বার্তা। আমাদের সামনে আরেকবার দৃশ্যমান করেছে এই বাস্তব যে, অমঙ্গল করাটাই রাষ্ট্রের প্রধানতম কাজ।

আমরা খেয়াল করে দেখেছি কিনা, এই আওয়ামী নেতৃত্বাধীন সরকার আসবার পরে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি সংসদীয় গণতন্ত্রের মোড়কে এক চরম কেন্দ্রীভূত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা জারি করেছে। ২০০৭-এর জরুরি ক্ষমতার সেনা-কর্পোরেট কর্তৃত্বের কালে নিও লিবারাল গণতন্ত্রের গাড়ি চলতে শুরু করেছিলো জোরেশোরেই। গাড়ি যেন ১০০ কিলোমিটার বেগে ছুটছে এখন! আর ওই অগণতান্ত্রিক সরকারের ভূত এই সরকারকেও পেয়েছে। রাষ্ট্রে এক ব্যান কালচার নেমে এসেছে। টিভি চ্যানেল কিংবা সংবাদপত্র নয় শুধু, রাষ্ট্রের অদৃশ্য তীক্ষ্ণ নখের আঁচড় পড়েছ এমনকি সাইবারস্পেসেও। আমরা মনে রেখেছি, ফেইসবুকের মতো একটা জনপ্রিয় স্যোশাল নেটওয়ার্কিং মিডিয়াকেও কয়েক দিন যাবৎ বন্ধ রাখবার সাহস করেছিলো এই সরকার। তারমানে কিন্তু রাষ্ট্র আরও বেশি করে আধিপত্যবাদী হয়েছে। নিও লিবারাল ধাঁচের আইনের শাসনের/পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসির নামে হত্যা-খুন-দমন-পীড়ন-দখল-শোষণ-প্রভু রাষ্ট্র তোষণ সব চলছে দেদারসে, ওদিকে আবার কথা বলবার সর্বশেষ পরিসরটুকুও যেন কেড়ে নিতে চাইছে এই সরকার। এই রাষ্ট্র। আমি ভীষণ ভীত হয়ে উঠছি। ভীত হয়ে উঠছি কখন না এই রাষ্ট্র একেবারে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার কথা বলা নিয়ন্ত্রণ করে, আমাকে ব্যান করে দেয়।

মঙ্গলধ্বনির সর্বশেষ কনটেন্টে ফুলবাড়ি কয়লাখনি নিয়ে একটি লেখা, সিরাজ সিকদারকে গ্লোরিফাই করে একটি লেখা আর ২৫মার্চ শেখ মুজিবের 'প্রশ্নবিদ্ধ' ভূমিকা নিয়ে একটি লেখা আপলোড করেছিলো মঙ্গলধ্বনির কর্মীরা। মঙ্গলধ্বনি তার জন্মলগ্নেই যেকোনো মত, ভিন্ন মত প্রকাশ করবার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই লেখাগুলোই হয়তো সরকারের গাত্রদাহের কারণ, আমার প্রাথমিক এবং একমাত্র অনুমান! এছাড়া বন্ধ করে দেবার আর কোনো কারণ আমি দেখি না।

সিরাজ সিকদারের রাজনীতির অনুগামী আমি নই, আমি কোনোভাবেই তাঁকে ধারণ করি না। আমি একমাত্র সমগ্র মানুষের প্রত্যক্ষ সম্মতি ছাড়া যেকোনো ধরনের সহিংসতার (এমনকি তা যদি মহৎ উদ্দেশ্যের নামেও হয়) তীব্র বিরোধী। এই জায়গা থেকে সহিংসতার বিরুদ্ধে আমার প্রত্যক্ষ অবস্থান। আমি শেখ মুজিবের অনন্য ঐতিহাসিক অবদানকে অস্বীকার করতে পারি না, আমার পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীর জনযুদ্ধের

ইতিহাস থেকে কোনোভাবেই তাঁকে ফেলে দিতে চাই না। ওই যে লেখাটি আপলোড করা হয়েছিলো, সেটা খুব জরুরি কোনো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ মনে হয়নি আমার কাছে! তো কি হয়েছে? আমার বলার থাকলে আমি বলবো! ওদের কথার বিপরীতে।

কিন্তু রাষ্ট্র এমন করে বোঝে না। যারা বলেছে তাদের বলার অধিকার কেড়ে নেয়। যদিও মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত, তাদের কাথা মতোনই। আবার আরেক দিক দিয়ে দেখি। রাষ্ট্রই যে ঠিক সেটা কোন যুক্তিতে নির্ধারিত? রাষ্ট্র যদি নিজেকে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে, তাহলে তাকে অবশ্যই জনগণের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হতে হবে। এই রাষ্ট্র মঙ্গলধ্বনি বন্ধ করবার সিদ্ধান্তটি কি গণতান্ত্রিকভাবে নিয়েছিলো? তারা কি জনগণকে জিজ্ঞেস করেছিলো, এটা বন্ধ করা উচিত কিনা? করেনি। এই রাষ্ট্র তাই কোনো অর্থেই গণতান্ত্রিক নয়। এই রাষ্ট্র কর্তৃত্বতান্ত্রিক। যা চলছে তার নাম গণতন্ত্র নয়, পার্লামেন্টারি কর্তৃত্বতন্ত্র।

রাষ্ট্র যখন ছোট্ট একটি ভিন্নমতের ওয়েব মিডিয়া বন্ধ করে দেয়, তখন বোঝা যায়, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ভয়ঙ্কর চোখ কতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে যে এমন ছোট একটি বিরোধিতার পরিসরকেও তারা সহ্য করতে পারছে না। এই সরকার ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে! এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাটিক সরকার। পার্লামেন্টে গণতন্ত্র থাকে না, গণতন্ত্র থাকে জনগণের সক্রিয় সিদ্ধান্তের মধ্যে। পার্লামেন্ট মঙ্গলধ্বনির ছোট্ট বিরোধিতাকে রক্ষা করতে পারে না। পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি আসলে এক ফ্যালাসি। কিন্তু পৃথিবীর একটা ভিন্নমতও যতোদিন চাপা পড়ে আছে ততোদিন পৃথিবীতে যথার্থ গণতন্ত্র আসতে পারে না। গণতন্ত্র মানে জনগণের ডিরেক্ট সিদ্ধান্ত। ডিরেক্ট ডেমোক্র্যাসি।

মঙ্গলধ্বনির শুরুতে আমারও কিছু অংশীদারিত্ব ছিলো ওটায়, আমিও লিখতাম ওখানে মাঝে মাঝে, আমার বলার অধিকার কেড়ে নিলো এই রাষ্ট্র। আমি ভীষণ ভীত হয়ে উঠেছি। আমার নীরবতা-স্থিরতা সরকারকে আরও নিরঙ্কুশ হতে দেবে আমার বিরুদ্ধে, আমি তাই বিরোধিতার জমিন প্রসারিত করতে শুরু করলাম। আমি আমার বলার অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা রাষ্ট্রকে মানি না। রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দেবার হুমকি দিলেও মানি না। মুক্ত মিডিয়ার স্বপ্ন দেখি সেই কবে থেকে। কর্পোরেট পুঁজির বিশাল বিশাল মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি নয়, মনুষ্যপ্রজাতির অগ্রগতির অনন্য স্মারক সাইবারস্পেসে আমরা একটি জায়গা বরাদ্দ নিয়েছিলাম। খুবই কম টাকায় বলেই পেরেছিলাম। সেই জায়গাটুকুতে মঙ্গলধ্বনিকে মুক্ত মিডিয়া বানিয়ে তুলবার সচেতন ইচ্ছা ছিলো আমার দিক থেকেও। রাষ্ট্র তা হতে দিলো না। একেবারে অন্যায়ভাবে, ফ্যাসিস্ট কায়দায়। ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের অভাবে ক্রমশ আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

অসময়ের কাগজ; ২০১১

'এসো বাংলাদেশ গড়ি'

সেনা কর্পোরেট কর্তৃত্বের গাড়িতে চড়ে বাংলাদেশের নিও লিবারাল দুনিয়ায় ভ্রমণপর্ব

GRONTHO.COM

এক

ক'দিন আগেই আমার জিপি ফোনটায় একটা এসএমএস দিয়েছে জিপি কর্তৃপক্ষ। লিখেছে, You are invited to 'esho Bangladesh gori'- a govt. initiated road show on June 9th at Sarkari Madrasha Maath in Rajshahi city. Come and visit Grameen phone stall. ঐ মেসেজ পাবার আগেই মিডিয়া মারফত জেনেছি; এই রোড শো, সরকারের এই সচেতনতামূলক পদক্ষেপ (আমার না, সরকারেরই ভাষ্যমতে) গাড়িতে করে জেলায় জেলায় যাবে। তারা আইনের শাসন কিংবা সুশাসন, খাদ্যাভাস পরিবর্তন, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করা, দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড এবং দুর্নীতিবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবে। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এটা তাদের প্রচারণামূলক পদক্ষেপ। তাদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়বার এই স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নকে গাড়িতে করে জেলায় জেলায় ঘুরে নিয়ে বেড়ানোর এই প্রক্রিয়াটির নাম ঠিক করলাম সেনা কর্পোরেট কর্তৃত্বের গাড়িতে চড়ে বাংলাদেশের নিও লিবারাল দুনিয়ায় ভ্রমণপর্ব। পাঠক, এজন্যই; এটাই আমার প্রবন্ধের শিরোনাম।

'এসো বাংলাদেশ গড়ি'– হ্যাঁ, বাংলাদেশ গড়বার চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুন বাংলাদেশ। কিন্তু কোথায় সেই নতুনত্ব। সেটা খুঁজে বের করবার দায় আছে আমাদের। সুতরাং সরকারের ক্ষমতাচাটা বুদ্ধিজীবীদের মতো করে বাংলাদেশ স্বর্ণযুগে প্রবেশ করছে বলাটা যেমন অলীক আর উদভ্রান্ত, ঠিক তেমনি করে বাংলাদেশ গোল্লায় যাচ্ছে কিংবা শেষ হয়ে যাচ্ছে কিংবা বাংলাদেশের আর ভবিষ্যত নাই এমন কথা বললেও কাজের কিছু হয় না। এটা খুবই ঠিক যে বাংলাদেশ একটি নতুন চেহারা পেয়েছে ১১ই জানুয়ারির পর থেকে। অন্তত নতুন চেহারা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কেমন বাংলাদেশ গড়তে চায় সরকার, কারা কারা মিলে সেই বাংলাদেশ গড়তে চায়, গড়তে গিয়ে কোথায় কোথায় ক্রাইসিসগুলো তৈরি হলো, কোথায় কোথায় তারা সাফল্যের সাথে কাজ সম্পাদন করলেন, যেটা পারলেন সেটা কেমন পারলেন, যেটুকু পারলেন না সেটুকু কেন পারলেন না, সবমিলিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত নতুন বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা দাঁড় করানোকে আমার কর্তব্য হিসেবে শনাক্ত করে এই প্রবন্ধ লিখতে বসা।

দুই

'এসো বাংলাদেশ গড়ি' গাড়িগুলো প্রকাশ্য যাত্রা করলো এই সেদিন। কিন্তু তার অনেক আগেই বাংলাদেশ গড়বার প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে এই সরকার। সেই ১১

জানুয়ারিতেই। কিন্তু ১১ জানুয়ারিও হুটহাট আসেনি। তার শর্ত নিহিত ছিল ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতায়। ৯০ পরবর্তী তথাকথিত গণতান্ত্রিক বিনির্মাণের মাঝ দিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সংবিধান সম্পর্কে খুব ভালো কোনো বোঝাপড়া সারতে পারিনি আমরা। রাষ্ট্রকাঠামো তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই থেকে গিয়েছিলো চরম জনবিচ্ছিন্ন। সেই একাত্তরে গণমানুষের জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটেছিলো। রাষ্ট্র একই পরিমাণে, প্রায় সেই পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসনামলের মতো করেই জনবিচ্ছিন্ন থাকায় স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা একটি দীর্ঘ সময় স্বৈরশাসনের যাতাকলে পিষ্ট হয়েছি। একই সেই জনবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রকাঠামোর[১] কারণে ৯০-এর পরও একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে ব্যর্থ হই আমরা। মুক্তিযুদ্ধের মতো একটা বিশাল জনযুদ্ধ করার পরও রাষ্ট্রের কাঠামো আর ক্ষমতার প্রশ্নটা ভালোভাবে মীমাংসা না করবার ব্যর্থতা যেমন করে আমাদের একটা রক্ষীবাহিনী-বাকশালী শাসন ব্যবস্থা অতঃপর সেনা-স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার যাতাকলে নিষ্পেষিত করেছিলো, একই সেই রাষ্ট্রকাঠামো ও ক্ষমতা প্রশ্নের মীমাংসা না করবার কারণে ৯০ পরবর্তী সময়েও যথার্থ গণতন্ত্র আসেনি। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। বলে রাখছি সেলিম রেজা নিউটনের সাথে *অভীপ্সার*[২] একটি দীর্ঘ আলাপচারিতায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি। সেটি এখনও অপ্রকাশিত।

ঐ যে বলছিলাম, ৯০ এর বিশাল সংগ্রামও যথার্থ গণতন্ত্র আনেনি, কিন্তু কিছু পরিবর্তন এনছিলো। পত্রিকার সেন্সরশীপ-সংক্রান্ত বেশকিছু বিধি বাতিল করা হয়েছিলো। মুক্ত বাজারের সঙ্গে সম্পর্কটা গভীরতর হচ্ছিলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেন ততদিনে রিগ্যান-থ্যাচারের মুক্ত বাজারের বিধানকে সঙ্গী করে নিও লিবারাল মতাদর্শ প্রচার করতে শুরু করেছে। এই নয়া উদারনীতি কিন্তু মোটেও নতুন নয়। উদার তো নয়ই। নোম চমস্কি জানান দিচ্ছেন,

> আন্তর্জাতিক সংযোজনের যে বিশিষ্ট আকারটিকে আজ অনুসরণ করা হয়েছে তাকে বলা হয়েছে নয়া উদারনৈতিক, কিন্তু এই কথাটাও ভীষণভাবে বিপথে চালিত করে। (প্রাসঙ্গিক) নীতিগুলো নতুন নয়, এবং কোনোভাবেই তা উদারতান্ত্রিকও নয়। এই কথাটাকে বিশেষ করে অপ্রতর্ক বলে ধরা উচিত এখানে। ইংল্যান্ড ও ভারতের দুই শতাব্দীর ইতিহাস খুবই পরিস্ফুটভাবে দৃষ্টান্ত যোগায় যে কীভাবে উদারতন্ত্রকে ক্ষমতা এবং ধ্বংসের এক যন্ত্রের আদলে ঢেলে সাজানো যায় আর এর সাম্প্রতিক রূপান্তরটি ওই প্রথাকেই বজায় রেখেছে, চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অবাধ বাণিজ্য ও উদারতন্ত্রের এই প্রথাগত দুমুখো মতবাদকে– আমি যাতে তোমাকে গুড়িয়ে দিতে পারি সে তোমার পক্ষে ভালোই; কিন্তু আমি জোর দেব শক্তিশালী বুড়ি রাষ্ট্রের সুরক্ষার উপরে এবং অন্যান্য আয়োজনের উপরে, যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে আমি বাজারের শৃঙ্খলাধীন নই, একমাত্র সেক্ষেত্রে ছাড়া যেখানে খেলার মাঠটা যাকে বলে সমতল, যার মানে হলো আমার অনুকূলে এতোটাই ঝুঁকে থাকা যে আমি নিশ্চিত যে আমিই জিততে পারব। এই হলো ভারতের ইতিহাসের শ দুয়েক বছরের একটা বড় অংশ।" [নোম চমস্কি: এগারই সেপ্টেম্বর ও তার ফলাফল: *কোনদিকে চলেছে দুনিয়া*, মনফকিরা প্রকাশন]

হ্যাঁ, এ শুধু ভারতবর্ষেরই ইতিহাস নয় এই ইতিহাস গোটা দুনিয়ারই ইতিহাস। এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতাতেই বাংলাদেশে আসে ১১ জানুয়ারি। আধা সামন্তবাদী আধা পুঁজিবাদী চৈতন্যের রাজনৈতিক শক্তিগুলো তখন জনবিচ্ছিন্নতার তীব্রতার কালে এসে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগালো। এই কাড়াকাড়ি এই মারামারি কোনোভাবেই নিও লিবারাল দুনিয়ার জন্য মসৃণ পথ নয়। আর তখন দুমাস কাল পেরিয়ে তৃতীয় মাসে এসে নতুন বছরে দৈশিক সেনা কর্তত্ব আর বৈশ্বিক সেনা কর্তত্বের পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে অরাজনৈতিক সরকারের লেবাস নিয়ে আরও বেশি পরিমাণে রাজনৈতিক মিশন নিয়ে আবির্ভূত হলো মইনউদ্দীন-ফখরুদ্দীন-ইয়াজউদ্দীনের এই সরকার। এই জরুরি অবস্থা। সমাজ-ইতিহাসের এই জরুরি পর্ব। পাঠক, বড়লোকী মিডিয়া আর ক্ষমতাচাটা বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে জানান দিতে চেয়েছে এবং জানান দিতে পেরেছে যে এই পরিবর্তন ঐতিহাসিক। অবশ্যই ঐতিহাসিক এই পরিবর্তন। কিন্তু ঐতিহাসিকতার সপক্ষের যে প্রচার-প্রচারণা সেটা একেবারেই ফালতু। এই ঐতিহাসিকতাকে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচার করবার প্রচেষ্টা আজ আর ধোপে টিকছে না। সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রের চেহারায় নতুন ঐতিহাসিক মাত্রা যোগ হওয়া এবং তাতে রাষ্ট্র রাজনীতির ইতিবাচক পরিবর্তনের যে প্রচারণা সেটা যে মিথ্যা তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্র-রাজনীতি আরও শক্তিশালী হয়েছে। আরও বেশি অগণতান্ত্রিক, আরও বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মানুষের মত প্রকাশের অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন করবার অধিকার বিলুপ্ত রাখা হয়েছিলো এই গতকাল পর্যন্ত। পত্রিকাতে স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত এবং অনিচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত সেন্সরশিপ[৩] অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে ৯০-এর গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পরবর্তী যেকোনো সময়ের তুলনায়। অপ্রকাশ্য রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বেড়েছে। স্বাধীন দেশে এই প্রথমবারের মতো দেশবরেণ্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের শরীর ঝলসে দেয়া হয়েছে ইলেকট্রিক শক দিয়ে। প্রকাশ্য রাষ্ট্রীয় নির্যাতনকে অনেক বেশি ন্যায্যতা দেয়ার কাজটি এগিয়েছে খুবই সুচারুরূপে। সর্বহারা জঙ্গি দমনের নামে একের পর এক মানুষকে কোনোরকম জবাবদিহিতা ছাড়াই 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী' কিংবা 'যৌথ বাহিনী' কিংবা অন্য কোনো বাহিনীর নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনী, রাষ্ট্রীয় জঙ্গিবাহিনী দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। সেনাবন্দুক ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। এমন কোনো জায়গা বোধকরি নেই, যেখানে সেই কর্তৃত্বের বন্দুক নেই। ঘুষ-দুর্নীতি প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে। সবমিলিয়ে রাষ্ট্র একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে যেখানে পরিবর্তনগুলোকে শনাক্ত করে ফেলতে পারি এভাবে:

১. রাষ্ট্র স্বাধীনতাত্তোর কালে সবথেকে বেশি শক্তিশালী হয়েছে তার নিপীড়নের শক্তি-সম্ভাবনা নিয়ে।

২. অনেক সংগঠিত বৈশ্বিক ক্ষমতাশক্তির পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে পরিচালিত হচ্ছে এই সরকার।

তিন

সরল সোজা বুদ্ধিতেই আমরা বুঝি, জনগণের প্রকৃত আয় যখন ক্রমাগত কমছে, সরল সোজা কথায় বললে, দ্রব্যমূল্যের সাথে সাথে জনগণের উপার্জনের হার যখন আনুপাতিকভাবে ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, মানুষ যখন আক্ষরিক অর্থেই না খেয়ে মরছে তখন রাষ্ট্রীয় গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে খুব প্রবলভাবে দমন-পীড়ন চালু না রাখা গেলে দেশে গণঅভ্যুত্থান ঘটে যাবার কথা। এই সেই কারণ যার জন্য আজও বহাল রাখা হয়েছে জরুরি অবস্থা। এই সেই কারণ যার জন্য তথাকথিত সার্বভৌমত্বের রক্ষক সেনাবাহিনী[৪] নেমে এসেছে জনতার টুটি চেপে ধরতে। গোটা সমাজটাকেই কারাগার বানিয়ে, চারদিকে বন্দুক তাক করে রেখে বাস্তবায়ন করবার চেষ্টা করা হচ্ছে নিও লিবারাল মতাদর্শ। মানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মতাদর্শ। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলবার মতাদর্শ। মুক্তবাজার-অর্থনীতির বাংলাদেশ গড়বার মতাদর্শ। আইনের শাসন জিনিসটাকে হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছি আমরা এরই মাঝে। আইনের শাসনের দোহাই দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপর পাশবিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো যায়। আইনের শাসনের নাম করেই হাসিনাকে ছেড়ে দেয়া যায়, খালেদাকে আটকে রাখা যায়। আবার দরকার পড়লে ছেড়ে দেবারও পায়তারা করা যায়। হ্যাঁ পাঠক, ২৯ জুলাই *যায়যায়দিন*-এ *গোলাম কাদেরের আশাবাদ/ খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিএনপির সাথে সংলাপ শিগগির* শিরোনামের রিপোর্টে যোগাযোগ উপদেষ্টার বরাত দিয়ে আমাদের জানান দিয়েছে সেই খবর। আইনের শাসনের নাম করেই যখন তখন গ্রেপ্তার করা যায় সেই তাকে যে প্রতিরোধ জারি রাখতে চায়। এই আইনের শাসনের নাম করেই পাশ হয়ে যায় সন্ত্রাসবিরোধী আইন যেখানে বিধান রাখা যায় মৃত্যুদণ্ডের। ১আগস্ট দৈনিক *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত রিপোর্টে দেখতে পাই, মানবাধিকার সংস্থা এসএএইচআর (সাউথ এশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস্) এই বিধান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছে, 'এটি নিরপেক্ষ বিচারের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে।'

আর আছে মতাদর্শ ও বাস্তবতার ফারাক। এই আইনের শাসনের মতাদর্শের বিপরীতেই তো বিনা বিচারে আটকে রাখা হচ্ছে অনেক মানুষকে। বিনা বিচারে মেরে ফেলা হচ্ছে একের পর এক মানুষ। চলেশ রিছিল হারিয়ে গেছেন আমাদের মাঝে থেকে। এই আইনের শাসনের বিপরীতেই দৈনিক পত্রিকা আমাদের জানান দেয়, র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তারের পর সন্ধান মিলছে না টঙ্গীর হাসান খানের। [*সমকাল*, ২৩ জুন, ২০০৮] ২৯ জুলাই ০৮ *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি সংবাদ সম্মেলন করে দুজন খুন হওয়া মানুষের পরিজনেরা জানিয়েছে, ঘুষ না পেয়েই সেন্টু আর রেজাউলকে হত্যা করেছে র‍্যাব। ১ আগস্ট ০৮ *প্রথম আলো* জানাচ্ছে, র‍্যাবের জিজ্ঞাসাবাদের সময় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে মাদারীপুরের একজন ব্যবসায়ী। ওদিকে নিও লিবারাল প্রজেক্টের অংশ হিসেবে দেদারসে চলছে

প্রাইভেটাইজেশান। টেলিযোগাযোগ খাত, ব্যাংকিং খাত, বিদ্যুৎ খাত ক্রমশ চলে যাচ্ছে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ক্ষমতার অধিকারী প্রাইভেট কোম্পানির কাছে। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ২২টি পাটকল। চট্টগ্রামের নিউমেরিং কন্টেইনার ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে।

চার

ওদিকে হাসিনা-খালেদা-নিজামী-সহ পুরোনো সামন্ত-অবশেষ-যুক্ত রাজনৈতিক শক্তি আবার জমিন পেয়েছে দাঁড়ানোর। বিকারগ্রস্ত চরম কেন্দ্রীকৃত ক্ষমতার অধিকারী এই সরকারের অবস্থা লেজেগোবরে হওয়ার পাটাতনেই আবার জেগে উঠেছে ওরা। খুবই লক্ষ্য করবার মতো বিষয় হলো ক্ষমতা কোনো তত্ত্ব মেনে চলে না। কোনো সরলরৈখিক অবস্থান নেই তার। সে ছড়িয়ে পড়ে। এই সেই চরম ভয়াবহ ঐতিহাসিক মুহূর্ত যখন নিও লিবারাল দুনিয়ার বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তির উদ্দেশ্যে গঠিত একটি সরকার স্বভাবগত কারণেই লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে। বিকারগ্রস্ত কেন্দ্রীকৃত ক্ষমতার অধিকারী হবার কারণে এই সরকার প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বাইরে গিয়ে অনেক কিছুই করে ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের উপর ইতিহাসের ঘৃণ্যতম নিপীড়ন-নির্যাতন, কথায় কথায় মামলা-হয়রানি-গ্রেপ্তার, সেনা কর্তৃত্বের চরম বহিপ্রকাশ এবং খোদ নিও লিবারাল লক্ষ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ-কারবার, চরম দুর্নীতি ঘটে চলেছে। দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান হয়েছে পক্ষপাতমূলক। সরকারের বিভিন্ন ফোর্সের সাথে সর্ম্পকিত যারা, তারা রেহাই পেয়েছে কেউ কেউ। রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে, সরকারের এই পর্বের চরম অগণতান্ত্রিক; চরম অন্যায্য-ঘৃণ্য-বর্বর-অমানবিক-গণবিরোধী-ফ্যাসিস্ট-স্বৈরাচারী কার্যক্রমকে সাংবিধানিক বৈধতা দেবার শর্তে আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতা হয়েছিলো বলে একটু একটু শোনা যাচ্ছিলো। একটু একটু করে মিডিয়ার কানাগলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো সেই খবর। সেই সমঝোতার কিছু নমুনাও পাওয়া গেলো। স্পষ্ট পক্ষপাত দেখা গেলো তাদের প্রতি। বিপরীতে মধ্যযুগীয় আচরণ করা হলো অপর প্রধান রাজনৈতিক দলের সাথে। গত কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাস-অত্যাচার-দুর্নীতি-নিপীড়ন-নির্যাতন-জঙ্গিতোষণের কাজ করেছে যে রাজনৈতিক শক্তি; সেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আজকের এই ক্ষমতার সাথে পাল্লা দিতে না পেরে মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার হলো। রিম্যান্ডের নাম করে ভেঙে ফেলা হলো তারেক রহমানের মেরুদণ্ডের হাড়। সেটা এমনকি জানতেও দেয়া হয়নি বহুদিন। এই গত কদিন আগে এসে জানতে পারা গেলো সেই খবর। মিডিয়ার, মানে রাষ্ট্রের এই প্রচারণাযন্ত্রের অবস্থাটা তাহলে একবার বুঝুন পাঠক। এমন একটা খবর তারা প্রকাশ করে না। অথবা প্রকাশ করতে পারে না। আদালতে যখন খালেদা জিয়ার পাশে তার দুই ছেলেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়, প্রচণ্ড অসুস্থ চেহারা নিয়ে যখন তাদের দাঁড়িয়ে রাখা হয় মায়ের সামনে, তখন সেটা আইনগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের সুবিধেই হয়। আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, অপরাপর সমস্ত রাষ্ট্রীয় আইন, মানে প্রাকৃতিক আইনের বিপরীতে মনুষ্যসৃষ্ট আইনের মতো করেই এই আইন মানবিকতার

বিপরীত জিনিস। আমরা সবাই জানি, ক্ষমতার চরম স্বৈরতান্ত্রিক প্রয়োগে, প্রচুর দুর্নীতি-স্বেচ্ছাচারে জর্জরিত তারেক রহমানকে। কিন্তু মানুষ হিসেবে এই রাষ্ট্রই তাকে অধিকার দিয়েছে ন্যায়বিচার পাবার।[৫] আবার এই রাষ্ট্রই রাস্তা তৈরি করে রেখেছে তাকে অজ্ঞাতে নির্যাতন করবার। এই রাষ্ট্রই রাস্তা তৈরি করে রেখেছে সেটা জানতে না দেবার। অবশেষে প্রচুর কথাবার্তার পর বিএনপি'র সাথেও সমঝোতার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেল।

রাজনৈতিক দলগুলোর চরম অগণতান্ত্রিক-সুবিধাবাদী-বেশ্যাবৃত্তিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে খুবই স্পষ্টভাবে। গতকালকের সংস্কারবাদী আজকে হয়ে উঠছে হাসিনা-খালেদার মুক্তির অগ্রদূত। গতকাল যে সংস্কারবাদীদের গালি দিয়ে হাসিনা-খালেদার মুক্তির ব্যাপারে কথা বলেছে আজকে সে যাচ্ছে সংস্কারবাদীদের সাথে লিয়াজো করতে। ড. কামাল হোসেনরা একাত্তরের গোলাম আযমদের ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। সরকারের সপক্ষে একের পর এক সাংবিধানিক ন্যায্যতা হাজির করে যাচ্ছেন। আবার রেগেও যাচ্ছেন হাসিনার সাথে যখন লিয়াজো হচ্ছে সরকারের। কটু কথা বলতে ছাড়ছেন না। কিন্তু এই সরকারের বছরজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি রাখার সাংবিধানিক অন্যায্যতার প্রশ্নে নিশ্চুপ থেকেছেন। মানবাধিকারের রক্ষক হিসেবে পরিচয়দানকারী এই লোকটি চলেশ রিছিল প্রশ্নে, বিনা বিচারে সর্বহারা-জঙ্গি নাম দিয়ে একের পর এক মানুষ হত্যার প্রশ্নে চুপ থেকেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক চেতনার বিপরীতে একগাদা দমন-পীড়ন-নির্যাতন-নিপীড়নের প্রশ্নে, সেই গত বছরের আগস্ট মাসে; আমরা শিক্ষার্থীরা মনে রেখেছি সেই ড. কামাল হোসেনের তখনকার ভূমিকার কথা। মনে রেখেছি, '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশের সময়কার আইনমন্ত্রী ড. কামাল খোদ স্বায়ত্তশাসন নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাশক্তির সাথে সুর মিলিয়ে আগস্টের সেই ছাত্র বিক্ষোভের সাথে শিক্ষকদের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির সম্পর্ক খুঁজেছেন।

ওদিকে সংস্কারবাদীরা কিংবা ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট; যেটি কিনা একেবারে নিও লিবারাল ছাঁচে তৈরি করা হলো, তারা আর টিকতে পারছে না খুব স্বাভাবিক কারণেই। আওয়ামী লীগসহ তার ১৪ দলীয় জোট আর বিএনপিসহ তার চারদলীয় জোট যতোখানি জনবিচ্ছিন্ন, এরা তার থেকেও জনবিচ্ছিন্ন। জনগণের সক্ষমতার/স্ব-ক্ষমতার প্রশ্ন, তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের প্রশ্ন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তার অংশীদারিত্ব-প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন, তার খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্ন, শিক্ষার অধিকারের প্রশ্ন একেবারে অনালোচিত থেকে গেছে এদের কাছে। তাই জনতা কোনোভাবেই ভুল করে এদের পেছনে হাঁটতে শুরু করেনি। বরং আওয়ামী লীগ বিএনপির সময় তাদের সীমিত আকারের যে মত প্রকাশের অধিকার হাজির ছিলো সেটাকেই ভালো মনে করেছে তারা। আর এরই সুযোগ নিয়ে আবার সরব হয়েছে পুরোনো সেই আধা সামন্তবাদী, আধা পুঁজিবাদী মানসিকতার রাজনৈতিক শক্তিরা।

তাদের নির্বাচনী ইশতেহারেও কোনোভাবেই সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র-রাজনীতির কোনো গুণগত পরিবর্তনের প্রশ্ন হাজির থাকবে না নিশ্চিত। সংবিধানের কালো অধ্যায়গুলো পরিবর্তনের প্রশ্ন, স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত সংখ্যালঘুর প্রশ্ন অথবা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন থেকে যাবে উপেক্ষিত। সঙ্গত কারণেই ১১ জানুয়ারির যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন তা নতুন কোনো ঐতিহাসিক যুগপর্বকে হাজির করবে না। আমরা খুব করে জানি, আবার আওয়ামী লীগ-বিএনপি ক্ষমতায় আসবে। আবার ফিরে আসবে সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের যুগ। আবার ফিরে আসবে রাজনৈতিক সহিংসতা, এমপি-মন্ত্রী ফুলেফেঁপে ওঠা, সন্ত্রাস প্রতিপালন, স্বৈরাচারী ক্ষমতার নির্বিচার প্রয়োগ। আমরা জানি হাওয়া ভবনের দুর্নীতিরা আবার ফিরে আসবে।

পাঁচ

এমন যে ঘটলো, তার কারণ রাষ্ট্র-রাজনীতির খেলা থেকে জনতা যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। ১১ জানুয়ারির পট-পরিবর্তনে কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচারণামাফিক জনতার যে পূর্ণাঙ্গ সমর্থনের কথা চাউর করতে চেষ্টা করা হলো সেটা সত্য নয়। অবশ্য এটা তো সত্য ঐ পরিবর্তনে জনতা নীরব ভূমিকা পালন করেছিলো। কোনো কথা বলেনি। স্বস্তিও হয়তো পেয়েছিলো খানিকটা। কিন্তু কোনো শরিকানা বোধ করেনি। ঐ পরিবর্তন আমজনতার সপক্ষে কোনো ম্যান্ডেট হাজির করেনি। জনগণের সক্রিয়তার প্রশ্নকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে। আজ যখন আওয়ামী লীগ-বিএনপি-সহ ডানপন্থী ও তথাকথিত বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলো জরুরি অবস্থা তুলে নিয়ে নির্বাচন দেবার কথা বলছে তখন তারা কিন্তু মোটেও জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত নয়। রাষ্ট্র-রাজনীতিতে জনগণের অংশীদারত্বের প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত নয়। জনতার জীবনমান-অধিকার-সক্ষমতার প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত নয়। আগামী ৫ বছর ধরে লুটপাট আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েমই তাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য জনগণের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। পরিষ্কার বলেই আওয়ামী লীগ-বিএনপির সাথেও জনগণ কোনো শরিকানা বোধ করছে না। কোনো গণঅভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। চোখের সামনে স্পষ্ট করে হাজির থাকছে সেই সত্য যে, নিও লিবারাল মতাদর্শে আরও খানিকটা দীক্ষিত হয়ে অক্টোবর পূর্ববর্তী পরিস্থিতির দিকে প্রত্যাবর্তন ঘটছে আমাদের।

আমরা যারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এখনও সৎ আছি, আমরা যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব চাই না, আমরা যারা রাষ্ট্রকে আদতে একটা গণবিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শনাক্ত করতে শিখেছি তারা তাই দায় অনুভব করি। দায় অনুভব করি এই পরিস্থিতির একটি বিশ্লেষণ দাঁড় করানোর। দায় অনুভব করি তৎপর হবার। আমরা বারংবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জনগণের অংশীদারত্বের প্রশ্ন নিয়ে কথা তুলতে থাকি। সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র কোনো সমাধান না। যথার্থ গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। জনগণের প্রতিনিধিদেরকে যেন বারবার জনগণের মতামতের উপর নির্ভর করে চলতে হয়, রাষ্ট্র-কাঠামোতে তেমন ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে।

আনবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা পাঁচ বছর ধরে আমাদের এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধিকে স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেব নাকি যখন-তখন তার প্রতি অনাস্থা আনতে পারব সেটা নিয়ে ভাবতে হবে। সংবিধানে আইন-জেল-জুলমের ব্যবস্থা তথা যাবতীয় মানবাধিকার হরণের ব্যবস্থার বিপরীতে আমরা কী করব সেটা ভাবতে হবে। বাজার-অর্থনীতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে স্বাধীন উৎপাদনভিত্তিক অর্থনীতির প্রশ্ন সামনে আনতে হবে। দুনিয়াজোড়া মার্কিন-বৃটিশ আধিপত্যের এই কালে সার্বভৌমত্ব যেখানে সোনার পাথর-বাটির মতোই হাস্যকর ধারণা হয়ে উঠেছে, সেখানে সেনাবাহিনীর প্রশ্নে আমাদের অবস্থান কী হবে সেটা ভাবতে হবে। স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখব কিনা ভাবতে হবে। আমরা যখন বুঝতে শিখেছি, সেনাবাহিনী মানেই হলো রাষ্ট্রীয় গণবিরোধিতার সপক্ষে বন্দুক-কামান-বোমা দিয়ে প্রতিরোধ স্তিমিত করবার প্রচেষ্টা; আমরা যখন আজ হাড়ে হাড়ে টের পেলাম সেনাবাহিনী মানেই হলো নিও লিবারাল প্রজেক্ট বাস্তবায়নের পথ মসৃণ করা; আমরা যখন বুঝতে শিখেছি সেনাবাহিনী মানেই হলো জাতিগত সংখ্যালঘু-আদিবাসী-পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন-নিপীড়ন আর বাঙালি আধিপত্য পোক্ত করবার প্রচেষ্টা; আমরা যখন বুঝতে শিখেছি চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লে এবং মানুষ আক্ষরিক অর্থেই না খেয়ে থাকলে যে প্রতিরোধ জন্ম নেবার কথা এবং সেই প্রতিরোধ-বাসনা থেকে অপরাপর না খেয়ে থাকা মানুষের সাথে এককাতারে দাঁড়িয়ে এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে নামবার কথা তাকে ঠেকিয়ে দেয়াই সেনাবাহিনীর কাজ; আমরা যখন বুঝতে শিখলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন চিন্তা-কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রাখতে মিছিলে নামলে যখন জেলহাজত আর অমানুষিক নির্যাতন হয় তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনে নামলে সেটাকে গুড়িয়ে দিতে সংগঠকদের একের পর এক সেলফোনে হুমকি দেয়াই সেনাবাহিনীর কাজ– তখন সেনাবাহিনী নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের। এখানে বলে রাখাটা খুবই দরকারি যে, সেনাবাহিনীর সদস্যদের একজনের উপরেও আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাগ নেই, ঘৃণা নেই, ক্ষোভ নেই। আমি সত্যি করে বলছি, সেনাবাহিনীর যে সদস্যটি ইলেকট্রিক শক দিয়ে ঝলসে দিয়েছিলো আমার শিক্ষকের হাত, তার প্রতিও আমার রাগ নেই। মমতা আছে, ভালোবাসা আছে। তাকে কবীর সুমনের মতো করে[৬] আমি দেশপ্রেমের দিনমজুর হিসেবেই শনাক্ত করতে পারি। আমাদেরকে তাই ভাবতে হবে নতুন করে। প্রকৃত দেশপ্রেমিক সেনাঅফিসার কর্নেল তাহের যেখান থেকে ভাবতে শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে ভাবতে হবে। বাজার-অর্থনীতির এই নিও লিবারাল বাস্তবতায় মিলিটারিইজমকে ক্রমশ জনপ্রিয় করবার চেষ্টা চলছে। চলছে এই কারণে যে, বাজার-অর্থনীতি এমন এক অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত যেখানে উৎপাদনের লক্ষ্য মানুষ নয়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। এই অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত; মানুষ নয়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতাই যার লক্ষ্যস্থল তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় মানুষের না খেয়ে থাকাটা অন্যায্য-অন্যায়-পাপ। ক্রয়ক্ষমতা লক্ষ্য বলেই বিশ্বজুড়ে ক্ষুধার্ত নিরন্ন মানুষের দিকে বাজারের চোখ পড়ে না। খাবার দিয়ে বাজার তৈরি করে জ্বালানি। যে জ্বালানি ব্যবহৃত

হবে ঐ বাজার-বিস্তৃতকরণেরই কাজে। হ্যাঁ পাঠক, আমি এই প্রবন্ধের মালমশলা সংগ্রহ করতে গিয়েই যেদিন ইন্টারনেটে ৪০ টাকা খরচ করে ২ ঘণ্টা জুড়ে বায়ো ফুয়েল বিষয়ক সব লেখাপত্র সংগ্রহ করেছি তার পরদিনই বাধ্য হয়ে *প্রথম আলো* প্রকাশ করেছে ফাঁস হয়ে যাওয়া বিশ্বব্যাংকের গোপন এক প্রতিবেদন। যে প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, আজকে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সঙ্কটের মূলে রয়েছে খাদ্যদ্রব্য থেকে জ্বালানি তৈরির বিষয়টি। এই হলো বাজার-অর্থনীতি। এই অমানবিক-অন্যায্য-মানবাধিকারবিরোধী কার্যক্রমেরই অপর নাম বাজার-অর্থনীতি। এই অমানবিক-অন্যায্য-মানবাধিকারবিরোধী কার্যক্রমেরই অপর নাম নিও লিবারালিজম। বাজার-অর্থনীতি মানেই হলো বাড়তে থাকা ধনবৈষম্য। বাজার-অর্থনীতি মানেই হলো বিশাল বিশাল দানবীয় সব কর্পোরেশন। বাজার-অর্থনীতি মানেই হলো রাষ্ট্রের তথাকথিত সামাজিক চুক্তির অস্বীকার। বাজার-অর্থনীতিই সেই জমিন, যেখানে দাঁড়িয়ে অর্থ উপদেষ্টা বিশ্ববাজারের দোহাই তুলে ক্রমাগত যুক্তি সরবরাহ করতে পারেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সপক্ষে। বাজার-অর্থনীতিই সেই জমিন যার উপর দাঁড়িয়ে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যায় আমাদের কৃষি-অর্থনীতি, আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা। কৃষকের বীজতলা নেই, ধানের অঙ্কুরোদগম নেই, সুফলা কিনে ফসল ফলাই আমরা। কৃষকের হাতে বীজ নেই। জৈব সার আর কাজে লাগে না। কীটনাশক ছাড়া চাষ হয় না। জমিতে অন্য কোনো বীজ কাজে দেয় না। মানে বহুজাতিক কর্পোরেশনের সার-বীজ-কীটনাশক ছাড়া আমরা চাষ করতে পারি না। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। বিশ্বব্যাংক আইএমএফ ক্রমাগত প্রেসক্রিপশন সরবরাহ করে চলে কৃষিখাতে ভর্তুকি না দিতে। অবশেষে আমাদের কৃষকরা যখন বীজ-সার হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান, সেই পাটাতনে দাঁড়িয়েই বাজার-অর্থনীতির স্বপক্ষের এই কার্যক্রমই নির্ধারণ করে যে ২০০৮ সালে এসে মানুষকে ৩৮ টাকা কেজি দরে চাল কিনে খেতে হবে। না পারলে না খেয়ে থাকতে হবে। কথা বলা যাবে না। কথা বললে আছে জরুরি অবস্থা। কথা বললেই আছে মিলিটারি। আছে সেনাবাহিনী। এই হলো বাজার- অর্থনীতির সাথে মিলিটারিইজমের সংযোগ। দুনিয়ার সব অধিকারহারা বুভুক্ষু মানুষের দীর্ঘশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া প্রতিরোধের বাসনাকে যা দিয়ে নির্মূল করতে চেষ্টা করা হবে। আর এ সবের ক্ষেত্রে কলকাঠি নাড়বে কর্পোরেট মিডিয়া। বাজারকে গতিশীল রাখা যার কাজ। কেনা-বেচার এই যুগের জন্য মতাদর্শ সরবরাহ করা যার লক্ষ্য। নিজেও সে এক বিশাল বাজার। কর্পোরেট মিডিয়া সংবাদ বেচে, বাজারের মতাদর্শ বেচে। সে এক দানবীয় প্রতিষ্ঠান। লাভের আশায় রাক্ষসের মতো মুখ হা করে থাকে। নিও লিবারাল দুনিয়া তারও আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষাই বাস্তবায়ন করে চলেছে *প্রথম আলো*রা। নব্বই পরবর্তী 'গণতান্ত্রিক' বিনির্মাণের কাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি সুশীল সমাজ গঠন, তথাকথিত আধুনিক ভোগবাদী মানস গঠন, সামন্ত-চেতনা সম্পন্ন রাজনীতির প্রতি বিষোদগার, দুর্নীতি বিরোধিতা, মৌলবাদ-সর্বহারা-জঙ্গিবাদ বিরোধিতা যার লক্ষ্য হিসেবে হাজির থেকেছে এবং তেমন মানস গঠনে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে

পেরেছে। নিও লিবারাল দুনিয়ায় বাংলাদেশের এই যাত্রাপথে সেনা-কর্পোরেট কর্তৃত্বের গাড়ি আর এলিট মিডিয়ার যৌথ প্রচারণা কৌশলের মাঝে, মানে রাষ্ট্র আর কর্পোরেট শক্তির মাঝে সঙ্গত কারণেই এক অপরিসীম ঐক্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই ঐক্য লক্ষ্যগত ঐক্য। অভিন্ন লক্ষ্য মানে নিও লিবারাল মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের সাথে গাঁটছাড়া বেঁধেছে কর্পোরেট মিডিয়া। *প্রথম আলো এটিএন বাংলা* খুঁজছে সাদা মনের মানুষ। যে মানুষ নির্জীব। যে মানুষ সাদা মনে মেনে নেবে এই সেনা-কর্পোরেট কর্তৃত্বের দুঃশাসন। যে মানুষ কোনো প্রশ্ন তুলবে না রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব নিয়ে। রাষ্ট্রক্ষমতায় জনতার অংশীদারত্বের প্রশ্ন নিয়ে। *এসো বাংলাদেশ গড়ি* গাড়ি-বহরকে ব্যাপক কাভারেজ দেওয়া হয়েছে। মিডিয়া যেন সরকারের পুলিশ বাহিনীর মতো করে খুঁজে বের করেছে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক আর সর্বহারা-জঙ্গিদের। সামন্ত-অবশেষ-যুক্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিরোধ জারি রেখেছে কর্পোরেট মিডিয়া। এখনও। অপরদিকে এই তো সেদিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতন্ত্রকামী শিক্ষার্থীরা টিএসসি'র সাথে *গ্রামীণ ফোনের* একটি চুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে সেটাকে নস্যাৎ করে দিলো; কিন্তু *প্রথম আলো* সেটাকে হাওয়া করে দিলো। এই সেই মুক্ত মিডিয়া। এই সেই গণতান্ত্রিক মিডিয়া। এই সেই নিরপেক্ষ মিডিয়া। পাঠক, আমরা চিনতে পারছি তো, এই সেই নিও লিবারাল প্রচারণার যন্ত্র। আজকের বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করে দুর্নীতি হলো বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। এই ভয়াবহ মিথ্যে কথাটা প্রচারণার মাঝ দিয়েই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষের মস্তিষ্কে। ঢুকিয়ে দিয়েছে সত্যজিতের হীরক রাজার দেশের সেই মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্র। ঢুকিয়ে দিয়েছে কর্পোরেট মিডিয়া। দুর্নীতি মানে কিন্তু রাষ্ট্রীয় আমলা আর রাজনীতিকদের দুর্নীতি। বৈদেশিক বিনিয়োগের বাধা ওটা। ঐ দুর্নীতি মানেই মসৃণভাবে বাজার পরিচালিত না হওয়া। মানে কর্পোরেট স্বার্থের জন্য আঘাত। মানে *প্রথম আলোর* বিরুদ্ধেও আঘাত। তাই তার বিরুদ্ধে *প্রথম আলোদের* জেহাদ। বিশাল বিশাল কর্পোরেট দুর্নীতি নিয়ে কোনো কথা নেই। এসো বাংলাদেশ গড়ি গাড়ি বহরের অন্যতম সঙ্গী এবি ব্যাংক শেয়ার বাজারের কেলেঙ্কারীর সাথে জড়িত বলে রিপোর্ট করেছিলো *প্রথম আলো*। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। ঐ দুর্নীতি তো দুর্নীতি নয়। আর কর্পোরেট মিডিয়া যখন মৌলবাদ-সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদ বিরোধিতার দায়দায়িত্ব নেয়, সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন করে তখন সেটাকে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদবিরোধী নয়া যুদ্ধের নামে দুনিয়াজোড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী তৎপরতার নিও লিবারাল মতাদর্শের প্রতি পূর্ণ সমর্থন হিসেবেই শনাক্ত করতে পারি। এগুলো মসৃণভাবে বাজার পরিচালিত হবার ক্ষেত্রে বাধা। আর তাই এখন একেবারে কোনো রকমের মানবাধিকারের তোয়াক্কা না করে সর্বহারা-জঙ্গি পরিচয়ের উছিলায় একের পর এক মানুষ হত্যা করা হচ্ছে।[৭] আর ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া জারি রাখতে, তাকে আইনগত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে তৈরি করা হয়েছে সন্ত্রাস-বিরোধী আইন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই নিও লিবারাল মতাদর্শ হলো মার্কেট-মিডিয়া-মিলিটারি তিন ম-এর মিলিত আধিপত্যের নাম।

সাম্রাজ্যবাদের নতুন চেহারা। *এসো বাংলাদেশ গড়ি* গাড়ি নিয়ে আমরা সেই বাসনা পূরণের লক্ষ্যেই যাত্রা শুরু করেছি।

তারমানে একদিকে জঙ্গি-দুর্নীতি-সর্বহারা-রাষ্ট্রীয় মালিকানা নির্মূলের প্রচেষ্টা অপরদিকে স্বাধীন চিন্তা নির্মূলের তৎপরতা- দুইয়ের মিলে কর্পোরেট কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ করতেই এই আইনের শাসন। এই জরুরি অবস্থা। বাজারের স্বার্থে মিলিটারিইজমকে প্রকাশ্যে দিবালোকে হাজির করা। মিডিয়ার আগ্রহও ওটাই। আর তাই *র‍্যাব-গ্রামীণ ফোন* মিডিয়া মিলেমিশে একাকার *এসো বাংলাদেশ গড়ি* মেলায়। কিন্তু মানুষ জাগছে ঐ আমেরিকারই দক্ষিণ কোণে। হ্যাঁ পাঠক, প্রাযুক্তিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই যাকে কুক্ষিগত করা যায়নি পুরোপুরি; গোলকায়নের সেই প্রযুক্তি ইন্টারনেট আমাদের জানান দিচ্ছে, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর ঋণ পরিশোধ করে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাঝ দিয়ে বিকল্প ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। ল্যাটিন আমেরিকা আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। ওখানে প্রতিরোধ হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধ। সেই প্রতিরোধে গোটা দুনিয়া শামিল হবে। শামিল হবে বাংলাদেশের মানুষও, যে দেশের শিশু-কিশোর স্কুল শিক্ষার্থীকে ৫ ঘন্টা জোর করে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে রেখে *এসো বাংলাদেশের গড়ি*র নিও লিবারাল প্রজেক্টে অংশ নেওয়াবার চেষ্টা করা হয়।

যদি ল্যাটিন আমেরিকা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জনগণের অংশীদারত্বের প্রশ্ন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন, এবং শাসনতান্ত্রিক সরকারের বিপরীতে জনতার প্রতিনিধিত্বশীল উৎপাদনভিত্তিক একটি রাষ্ট্রকাঠামোর প্রশ্ন সামনে আনতে পারে তাহলে এই বাংলাদেশের মানুষও শামিল হবে নিশ্চিত। খুবই সত্যি কথা যে, এই নিও লিবারাল বাস্তবতায় আমরা একা একটি রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে মুক্ত সমাজ গড়তে পারব না। সমাজতন্ত্র আনতে পারব না। নিকারাগুয়া-সুদান-মেক্সিকো-ইরাক-আফগানিস্তান আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। তাই বিশ্বব্যাপী মুক্ত সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে জমতে থাকা মানুষের ঐক্য দরকার। ইন্টারনেট আছে। পুঁজিবাদী প্রচারণার এই যন্ত্র তার প্রাযুক্তিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই হয়ে উঠেছে প্রতিরোধেরও অস্ত্র। আন্তর্জাতিক মানুষ হবার বাসনাকে সে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। পরিশেষে, নোম চমস্কির শরণ নিচ্ছি। আর্জেন্টিনার লড়াকু শ্রমিকেরা চমস্কিকে জানিয়েছিল, খাঁচার মেঝে প্রসারিত করবার লড়াই করছে তারা। চমস্কি যোগ করেছিলেন, সে খাঁচার সুরক্ষাও দরকার কখনও কখনও।[৮] দানবীয় কর্পোরেট আগ্রাসন যখন হাজির হয়। রাষ্ট্রকে তাই একদিক থেকে দানবীয় কর্পোরেশনের হাত থেকে রক্ষা করা আর আরেকদিক থেকে তার স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকা আমাদের এই মুহূর্তের কর্তব্য। শ্রেণীহীন সমাজ আমাদের আকাঙ্ক্ষা। সেই সমাজ আমরা চাই, যেখানে ব্যক্তিমানুষের সৃজনশীলতার পূর্ণতম বিকাশের নিশ্চয়তা থাকবে। থাকবে পূর্ণতর স্বাধীনতা। সে সমাজ গঠন করতে গেলে রাষ্ট্র দখল করে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র বানানোর কথা চিন্তা করলে হয় না। দরকার পরে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি অগণতান্ত্রিক-অন্যায্য পদক্ষেপকে

চ্যালেঞ্জ করতে থাকার। এই তৎপরতায় যারা আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের আশা করতে দোষ নেই, মার্ক্স স্বীকৃত মানুষের ইতিহাস শুরু হবে একদিন। আর আমাদের এই প্রাচ্যের মানুষকে গাইতে হবে না লালন সাঁইয়ের গান, 'এমন মানব সমাজ কবে/হবে গো সৃজন হবে/যেদিন হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান/জাতি-ধর্ম নাহি রবে ...

টীকাভাষ্য:

১. রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে গণতান্ত্রিক হওয়া কিংবা জনবিচ্ছিন্নতা এড়ানো কতখানি সম্ভব তা নিয়ে তর্ক আছে। তর্ক করেছেন মার্ক্সবাদীরা এবং নৈরাজ্যবাদীরা। এই তর্ক থেকে আমার সিদ্ধান্ত হলো, জনবিচ্ছিন্নতা এড়িয়ে রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক হতে গেলে রাজনৈতিক সরকার-ব্যবস্থার বিলোপ দরকার। শাসনতান্ত্রিক সরকারের বিপরীতে স্বাধীন উৎপাদনভিত্তিক সমিতির প্রতিষ্ঠা দরকার।

২. আমাদের ক'জন বন্ধুর সম্মিলিত প্রয়াস ছোটকাগজ *অভীপ্সার* পক্ষ থেকে সেলিম রেজা নিউটনের সাথে একটি আলাপচারিতা সম্পন্ন হয়েছিলো সেনা-কর্পোরেট কর্তৃত্বের জরুরি অবস্থার সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পরপরই।

৩. স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত সেন্সরশিপ বলতে বোঝাতে চেয়েছি সেইসব সেন্সরশিপকে যেগুলো কর্পোরেট ব্যবসায়িক স্বার্থের অনুকূল নয় বলে আরোপ করা হয়। এটাকে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপও বলা যেতে পারে। অনিচ্ছা নিয়ন্ত্রিত সেন্সরশিপ বলতে বোঝাতে চেয়েছি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আরোপকৃত সেন্সরশিপকে।

৪. কর্পোরেট মিডিয়ার এই যুগে প্রতিনিয়ত বাস্তবতাকে নির্মাণ করা হয় বলে শিখেছি মিশেল ফুকো, স্টুয়ার্ট হল প্রমুখের কাছে। সেনাবাহিনীকে সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে দেখাটা তেমনই একটা নির্মিত বাস্তবতা।

৫. রাষ্ট্র কাউকে অধিকার দেয় না এমনি এমনি। আসলে রাষ্ট্র অধিকার দিতে বাধ্য হয় মানুষের লড়াইকে উপেক্ষা করতে না পেরে।

৬. *একটি থালায়* শিরোনামে কবীর সুমনের এই গানের অ্যালবামের নাম আদাব। বের করেছে এইচএমভি, কলকাতা।

৭. চোর-ডাকাত-জঙ্গি যেই মরুক না কেন, আসলে কিন্তু মানুষই মরে শেষ বিচারে। কেউই চোর-ডাকাত-খুনী হয়ে জন্ম নেয় না। সামাজিক সম্পর্কের মাঝ দিয়েই মানুষ এমন হয়ে ওঠে। বিস্তারিত মতামতের জন্য দেখুন আমার 'বাংলাদেশ পরিস্থিতি: খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন মানুষের পরিস্থিতি আর মিলনের স্বপ্ন-আখ্যান' নামের প্রবন্ধটি। পাবেন *অভীপ্সা*, বাংলাদেশ পরিস্থিতি সংখ্যা, ২০০৬ তে।

৮. রাষ্ট্রকে সুরক্ষা করা বলতে আসলে আপেক্ষাকৃত আরও বেশি ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় সীমানার অভ্যন্তরে বসবাসকারী মানুষদের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে।

সাপ্তিক; ২০০৮

অস্ত্রধারী *প্রথম আলো* এবং সেনা-কর্পোরেট-সুশীল কর্তৃত্বের শপথ: আমাদের বদলে দেয়া আর বদলে যাওয়ার প্রশ্ন

বদলে যাবার আর বদলে দেবার শ্লোগান একসময় খুব বেশি শোনা যেতো বামপন্থী বলে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে। সমাজ বদলের গান এখনও তারা মিউ মিউ করে যে গায় না তা নয়, তবে অনেক উচ্চস্বরে এই গান এখন শোনা যায় কর্পোরেট-বাণিজ্যিক-মতাদর্শিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে। বাংলালিংক কিংবা *প্রথম আলোর* কাছ থেকে। এই পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ এবং মনোযোগের দাবিদার বলে আমার কাছে মনে হয়। আজকের জন্য *প্রথম আলোকে* সেই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বিবেচনা করে আমার আলাপ।

পত্রিকা দেখা হচ্ছিলো না গত সাত দিন, ফেইসবুক-বন্ধুদের কল্যাণে ঐ ফেইসবুক মারফত জানা গেলো খবর। *প্রথম আলোর* শপথ কর্মসূচির খবর। তারপরে অনলাইন সুবিধা গ্রহণ করে সংগ্রহ করা হলো এ সংক্রান্ত রিপোর্ট আর *প্রথম আলোর* ছাপা বিজ্ঞাপন দুটি। এগুলোই এই লেখার কাঁচামাল। ১৯/০৫ তারিখে জাতীয় দৈনিক *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত *প্রথম আলোর* শপথ সংগ্রহ কর্মসূচি ২১ মে থেকে শিরোনামের রিপোর্ট থেকে হুবহু উদ্ধৃত করছি:

> একটি একটি করে শপথে একদিন বদলে যাবে দেশ'-- এ স্বপ্ন নিয়ে *প্রথম আলো* ২১ মে থেকে দেশের ৬৪ জেলায় শপথ সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু করবে। যে কোনো নাগরিক নির্দিষ্ট ব্যানারে ভালো কাজের পক্ষে বা খারাপ কাজের বিপক্ষে পরিবর্তনের একটি শপথ লিখে সই করতে পারবেন। আগামী জুনের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ ঐ শপথ সম্বলিত ব্যানারগুলো একত্র করে প্রদর্শন করা হবে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে।
>
> দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'বদলে যাও বদলে দাও' শ্লোগান নিয়ে নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করা *প্রথম আলো* এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। গতকাল সোমবার কাওরান বাজারে *প্রথম আলোর* কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, নিজের মাধ্যমে সমাজ ও জাতিকে বদলে দেওয়ার আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করতে দেশজুড়ে সাড়া জাগানো এবং মানুষের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টিই শপথ সংগ্রহ কর্মসূচির লক্ষ্য।
>
> সম্মেলনে জানানো হয়, ২১ মে ৫জনের তিনটি দল বদলে যাও বদলে দাও শ্লোগান সম্বলিত গাড়ি নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করবে। এজন্য ৬৪ জেলার ৬৪ স্থানকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রচারপত্র বেতার টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ও টকশোর মাধ্যমে আগেভাগে জনগণকে এই কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতন করা হবে। এছাড়া *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রতিবেদক স্থানীয় প্রতিনিধি ও বন্ধুসভার সদস্যরা অঙ্গীকার সংগ্রহের গাড়ি নিজ এলাকায় পৌঁছানোর

তিনদিন আগে থেকে প্রচারকাজ শুরু করবেন। অঙ্গীকার সংগ্রহ করে ২০ দিন পর দলগুলো ঢাকায় ফিরবে। অঙ্গীকার সংগ্রহে *প্রথম আলোর* এই কর্মসূচির প্রধান সহযোগী চ্যানেল আই, এবিসি রেডিও ও ডেইলি স্টার। সংবাদ সম্মেলনে চ্যানেল আই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা বলেন, বদলে যাও বদলে দাও কর্মসূচির মূল কথা কেউ বদলে দেবে এবং কেউ বদলে যাবে। তবে নিজেকে বদলাতে হবে আগে।

মতিউর রহমান বলেন, ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের না বদলালে সমাজ তথা জাতির বদল কখনও আসবে না। আমরা সাংবাদিক ব্যবসায়ী এনজিও ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক নেতা-সহ অনেকেই অনেক কথা বলি ও অঙ্গীকার করি। কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগই পূরণ করি না। পরে তিনি বলেছেন, দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে *প্রথম আলোর* কর্মীরা প্রত্যেকে একটি করে ইতিবাচক পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু নিজের কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের এই অঙ্গীকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাই দেশের লাখ লাখ নাগরিকের কাছ থেকে শপথ সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ডেইলি স্টারের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ফাহিম মুনায়েম বলেন, 'বিশ্বের অনেক দেশে একজন মডেল যে পণ্যের বিজ্ঞাপনে অংশ নেন তাকে সেই পণ্য ব্যবহার করতে হয় এবং এটা করতে তিনি আইনত বাধ্য। এভাবেই আমরা প্রত্যেকে নিজের মাধ্যমে সমাজ বদলে ভূমিকা রাখতে পারি।

এবিসি রেডিও'র বার্তা ও অনুষ্ঠান প্রধান সানাউল্লাহ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি বদলানোর প্রতিশ্রুতি দিলে তা সামগ্রিকভাবে এবং পর্যায়ক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বদলাতে পারে। একজন ব্যক্তি বদলানোর প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি নিজেই তা করার চাপ অনুভব করবেন।

দেশের ১৮জন বিশিষ্ট নাগরিকের কাছ থেকে একটি করে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হতে যাচ্ছে এই কর্মসূচি। তাদের মধ্যে আছেন, ফজলে হাসান আবেদ, মোজাফফর আহমদ, জামিলুর রেজা চৌধুরী, আব্দুলাহ আবু সায়ীদ, আনিসুজ্জামান, কাইয়ুম চৌধুরী, সুলতানা কামাল, রাশেদা কে চৌধুরী, রেজওয়ানা চৌধুরী, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, ফেরদৌসী মজুমদার, আবুল হায়াত, নির্মলেন্দু গুণ, আফজাল হোসেন, রাজা দেবাশিষ রায় প্রমুখ। সংক্ষিপ্ত বার্তার (এসএমএস) মাধ্যমেও বদলে যাবার অঙ্গীকার সংগ্রহ করা হবে। ঠিকানা: আপনার শপথ আপনার নাম শহরের নাম এবং পাঠিয়ে দিন ২২২১ নম্বরে।

অনিবার্যভাবেই যে প্রশ্নগুলো এখান থেকে উঠে যায়:

- কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা খারাপ কাজ সেটা নির্ধারণের মাপকাঠি কে ঠিক করে দেবে?

- *প্রথম আলোর* নতুন আঙ্গিক বলে যে আঙ্গিকের কথা বলা হলো সেটা কেমন জিনিস? কিসে নতুনত্ব?
- নিজের মাধ্যমে সমাজ ও দেশকে বদলে দেবার যে আন্দোলন শুরু হয়েছে বলে মতিউর রহমান দাবি করেছেন সেটার ঘোষণা কবে কে দিলো? *প্রথম আলোকে* কে তার নেতা নির্বাচন করলো?
- নিজেকে বদলে ফেলা বলতে *প্রথম আলো* সুনির্দিষ্ট করে কী বোঝাতে চাইছে?
- *প্রথম আলোর* কর্মীরা কী অঙ্গীকার করেছে? তার প্রদর্শনী কবে হবে?
- সম্পাদক মতিউর রহমান নিজে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কী শপথ নিয়েছেন?
- সবোপরি *প্রথম আলো* নিজে বদলে যাওয়া ও বদলে দেবার জন্য কী শপথ নিয়েছে সামগ্রিকভাবে?

শুধু রিপোর্টই নয়, শপথ কর্মসূচির বিজ্ঞাপনও ছেপেছে *প্রথম আলো*। দুটি বিজ্ঞাপন হাতে পেয়েছি ফেইসবুক বন্ধুদের কল্যাণে।

GRONTHO.COM

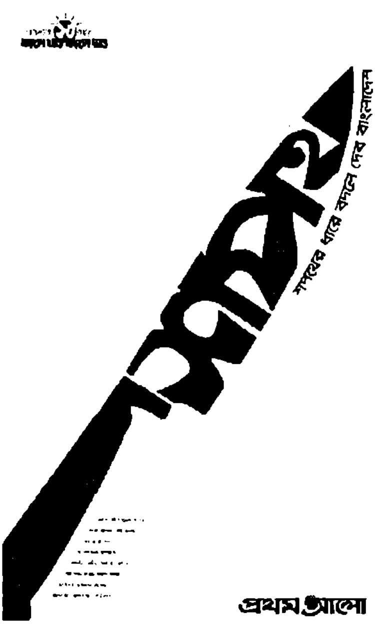

বিজ্ঞাপন-১

ছুরি দিয়ে শপথকে প্রতীকায়িত করা এই বিজ্ঞাপনের টেক্সট বলছে: "এবার সেই শপথের পালা। যার আঘাতে কেটে যাবে সব অনাচার। সেই শপথের অপেক্ষায় আপনি আমি সারা বাংলাদেশ। সেই শপথ সংগ্রহ করার জন্যই আপনার এলাকার আসছে বদলে যাও বদলে দাও ব্যানার।"

বিজ্ঞাপন-২

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি দেখুন পাঠক, ছবিতে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে শপথকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। এটাতে কি শপথের ধার বোঝানো হয়? নাকি শপথের সাথে বলপ্রয়োগের সম্পর্ক রচনা করা হয়! *প্রথম আলো* সে উত্তর দেয়নি। উত্তর দেয়নি অনাচার বলতে তারা ঠিক কোন কোন জিনিসকে নির্দিষ্ট করতে চাইছে। উত্তর দেয়নি সেই প্রতীকী গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্নটির, ছুরি বা চাইনিজ কুড়াল দিয়ে শপথকে প্রতীকায়িত করা হলো কেন?

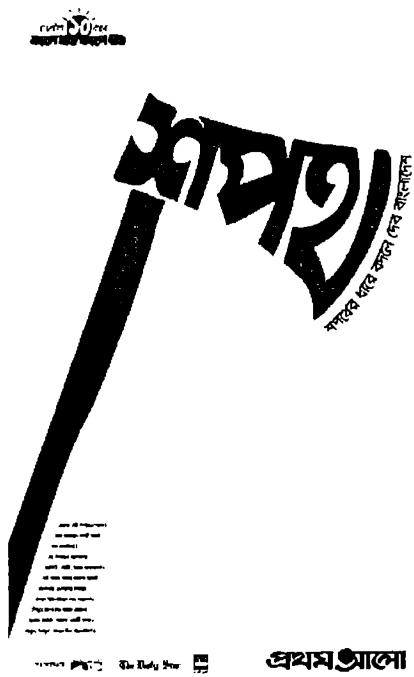

"এবার সেই শপথের পালা। যার আঘাতে কেটে যাবে সব অনাচার। সেই শপথের অপেক্ষায় আপনি আমি সারা বাংলাদেশ। সেই শপথ সংগ্রহ করার জন্যই আপনার এলাকার আসছে বদলে যাও বদলে দাও ব্যানার"-- সেই শপথ কী নির্দেশ করে, শপথ তবে কি 'সেই' শব্দ দ্বারা আবদ্ধ নয়? তার মানে কি এই যে নির্দিষ্ট 'সেই' শপথ *প্রথম আলো* করাতে যাচ্ছে? ছুরি আর চাইনিজ কুড়াল নিয়ে শপথ কিংবা ছুরি আর চাইনিজ কুড়ালের মতো শপথ? উত্তর চাই, মতিউর রহমান। কিন্তু মতিউর রহমানরা উত্তর দেবার দায় অনুভব করেন না।

এতসব প্রশ্নের উত্তর যখন *প্রথম আলো* আমাদের কাছে দেয় না তখন কেন আমরা পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে *প্রথম আলোর* কাছে যাবো? সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মহামান্য সম্পাদক মতিউর রহমান। রিপোর্টেই দেখছি, বলেছেন তিনি:

> আমরা সাংবাদিক ব্যবসায়ী এনজিও ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক নেতা সহ অনেকেই অনেক কথা বলি ও অঙ্গীকার করি। কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগই পূরণ করি না।' পরে তিনি বলেছেন, 'দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে *প্রথম আলোর* কর্মীরা প্রত্যেকে একটি করে ইতিবাচক পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু নিজের কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের এই অঙ্গীকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাই দেশের লাখ লাখ নাগরিকের কাছ থেকে শপথ সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এখান থেকেই ভয়াবহ প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্নটা হলো মতিউর রহমানের নিজের ভাষ্য অনুযায়ীই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হলো তারা। সাংবাদিক-এনজিও ব্যক্তিত্ব-ব্যবসায়ী-রাজনৈতিক নেতারা। *প্রথম আলোর* কর্মীরা তাই শপথ নিয়েছেন কেন, সেটা না-হয় বুঝলাম। এবার অন্য অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরা শপথ করুক *প্রথম আলোর* সাথে মিলে মিশে। কিন্তু শপথ ভঙ্গকারী হিসেবে যাদেরকে শনাক্ত করা যায়নি, সেই লাখ লাখ জনতাকে কেন অস্ত্র ধরে শপথ করানো হবে? তারা কী প্রতিশ্রুতি মতিউর রহমানকে দিয়েছিলো আর কী প্রতিশ্রুতিই বা ভঙ্গ করেছে? সব থেকে বড় কথা হলো *প্রথম আলোর* মতো একটা জাতীয় দৈনিক জনগণের কাছে শপথের কর্মসূচি নিয়ে যায় কেন? যেতে পারে কেন? সে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা নিচে খুঁজে দেখবো।

যে লাখ লাখ মানুষ শপথ নেবে ভালো কাজের, তারা কি রাষ্ট্র চালায়? যারা রাষ্ট্র চালায়, মতিউর রহমানের সেই ব্যবসায়ী-এনজিও কর্মী-সাংবাদিক-রাজনীতিক সেই তারা আর জনগণ তো এক না। জনগণ হলো মুষ্টিমেয় কিছু রাষ্ট্রীয়-বহুজাতিক অন্যায্য কর্তৃত্বের নির্মম শিকার। বাজারের নিরূপায় গ্রাহক। রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের নির্মম শিকার। তারা ভালো কাজের শপথ নিয়ে কী করবে। ধরা যাক, আমার কাছে এসেছে *প্রথম আলো*। আমাকে ছুরি ধরে বললো শপথ কর, ভালো কাজের। আমি শপথ করলাম, দেশ থেকে যাবতীয় আগ্রাসী কর্পোরেট কোম্পানিকে বিতাড়িত করব, যারা আমাদের জাতিরাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য হুমকি, যারা আমাদের কৃষি ধ্বংস করেছে, শিল্প ধ্বংস করেছে, আমাদের তেল-গ্যাস-খনিজ-বিদ্যুৎ-বন্দরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে কিংবা করতে চাইছে। আমার এই শপথ আমি রাখতে পারব কীভাবে? এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রধানতম বাধা হয়ে দাঁড়াবে যারা; তাদের প্রথম কাতারে থাকবে কর্পোরেট *প্রথম আলো*। কেননা সে নিজেও কর্পোরেট এবং দেশে কর্পোরেট পুঁজির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা তার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

আমরা ১/১১ সরকারের ক্ষমতায় আসীন হবার সাথে এবং তার *এসো বাংলাদেশ গড়ি* প্রজেক্ট নিয়ে নিও লিবারাল যাত্রার সাথে *প্রথম আলোর* সাম্প্রতিক এই কার্যক্রমকে মিলিয়ে পড়তে আগ্রহী। পাঠক, ১১ জানুয়ারির সেই নিরঙ্কুশ সিভিল-মিলিটারি-কর্পোরেট কর্তৃত্বের যুগপর্বকে আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম মার্কেট মিডিয়া মিলিটারি তিন ম এর মিলিত আধিপত্যের যুগ হিসেবে; যা আমাদের সামনে দৃশ্যমান করতে চেয়েছিলো একটি মসৃণ নিও লিবারাল বাস্তবতা।[১] কেন্দ্রস্থ পুঁজিবাদী স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তাদের কর্পোরেট কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থে অবাধ বাজার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশে দেশে সুশাসন-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন কায়েমের মাঝ দিয়ে যে ভয়ঙ্কর অসমতা ও স্বৈরতান্ত্রিকতা জারি রাখার প্রসেস সেটাই ১১ই জানুয়রির সরকারের মাঝ দিয়ে পাকাপোক্তভাবে জারি করবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় সেই সময়টায়। পাঠক, *প্রথম আলো* সেই সরকারের স্বঘোষিত পার্টনার!

হ্যাঁ পাঠক, এই মুহূর্তে দ্রুত লেখা সারবার জন্য আমি হুবহু উদ্ধৃত করতে পারছি না, তবে আপনি চাইলে আমি দেখাবো যে, *প্রথম আলোর* সম্পাদকীয়তে এমন ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে যে ১/১১তে যে সরকার আসীন হয়েছে তাদেরকে *প্রথম আলোই* সমর্থন যুগিয়েছে!

স্বৈরতান্ত্রিক এই কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান কোনো রকমের জবাবদিহিতার প্রশ্নকে উপেক্ষা করে মানুষের কাছে চাকু আর কুড়াল ঠেকাচ্ছে শপথের। এই শপথ কিসের শপথ তা *প্রথম আলো* না বললেও আমরা তার সামগ্রিক মিশনের মাঝ দিয়ে বুঝে নিতে পারি। দেশের নিও লিবারাল বাস্তবতা কায়েমের ক্ষেত্রে আইনের শাসন কায়েমের মাঝ দিয়ে সুশীল সমাজের আদর্শমাফিক বাজারের কাছে নির্মম আত্মসমর্পনের জন্য একটি জনগোষ্ঠী তৈরির মতাদর্শ সরবরাহকারী এই *প্রথম আলো*। আমরা আগস্টের ছাত্র-বিক্ষোভের কালে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তাকে চিনেছি। দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা হিসেবে সেনা-সদস্য কর্তৃক শিক্ষার্থী নির্যাতনের প্রতিবাদে দুই দিন মৌন মিছিল কিংবা সরব বিক্ষোভ করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সারা দেশে যখন প্রচণ্ড দমন-পীড়ন-নিপীড়ন-ধরপাকড়-এর শিকার হচ্ছি, চোখ বন্দী করে আমাদের সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে *প্রথম আলো* তখন স্ট্রেইট নিউজ (সাদামাটা নিউজকে আমরা সাংবাদিকতার পরিভাষায় স্ট্রেইট নিউজ বলে। সোজা বাংলায় বললে, ঘটনার ভেতরে প্রবেশ না করে চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে সেটাই বলে যাওয়ার নাম স্ট্রেইট নিউজ) করেছে। দৃশ্য বর্ণণা করেছে। একটা কলামও (শুরুর দিকে) ছাপা হয়নি যেখানে এই প্রক্রিয়াটাকে অন্যায্য বলা হয়েছে। শিক্ষকদের গ্রেপ্তারের খবর ছাপিয়েছে কয়েকদিন পর। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রথমাবস্থায় কোনো অবস্থান *প্রথম আলো* নেয়নি। আমরা এই *প্রথম আলোকে* চিনি।[২]

একদিকে মাদককে না বলা অপরদিকে মাদকেরই আরেক রূপ পেপসি-কোককে অব্যাহতভাবে বিজ্ঞাপনী ও মতাদর্শিক সমর্থন দিয়ে যাওয়া, একদিকে নারী পাতা নারীমঞ্চ করা অপরদিকে নকশা পাতার মতো পাতা বানিয়ে নারীকে পুঁজিবাদী বাজারের বিক্রয়যোগ্য পণ্য কিংবা সৌন্দর্য গ্ল্যামার বাণিজ্যের ক্রেতা বানানো আর প্রাযুক্তিক অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রেখে বেড়ে ওঠা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে ২১ শতকের জীবনধারা হিসেবে নির্মাণ করবার প্রয়াসের কথা জানি আমরা। আমরা জানি দেশপ্রেমের কথা বলে জাতিরাষ্ট্রকে বহুজাতিক কোম্পানির তাবেদার বানানোর প্রক্রিয়া। ভাষা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাঙালি আধিপত্য (*প্রথম আলো* কি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভাষার প্রশ্নে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলো?) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার কথা । আমরা জানি, দেশের তেল-গ্যাস-জাতীয় সম্পদ-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষার প্রশ্নে *প্রথম আলো* কোনো সুস্পষ্ট অবস্থান নেয় না কখনও, অমুক তমুক বিতর্ক নাম দিয়ে একেবারে ভিন্নমতশূন্য কৌশলগত বিতর্ক চালিয়ে নেয় তার তাঁবেদার বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে (বলে রাখছি মাঝে

মাঝে আনু মুহম্মদের মতো বুদ্ধিজীবীদের লেখাও তাদের ছাপতে হয়, সেটা নেহাতই ব্যতিক্রম)। আমরা মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর স্বার্থে নিত্য প্রচারণা জারি রাখার কথা জানি। দশ সৃজনশীল আর দশ মননশীল নাম দিয়ে সাহিত্য জগতের সেরা নির্বাচন এবং পুরস্কার প্রদান করে তাদেরকে পালিত বুদ্ধিজীবী, পালিত সাহিত্যিক বানিয়ে সাহিত্য জগতের হর্তাকর্তা বনে যাওয়ার প্রয়াসটাও প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে এখন। যে মঞ্চকে নিয়ে গর্ব করা হতো, যে নাটককে বলা হতো শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার– সেই মঞ্চ-নাটকের ভালোমন্দ দেখবার দায়দায়িত্বও *প্রথম আলো* নিয়েছে। মজার এক ঐক্য। মঞ্চ নাটকে যারা শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেন, তারাই আবার অ্যাড ফার্মের মালিক, তারাই আবার *প্রথম আলোর* স্টার আর সেই *প্রথম আলোই* আবার মঞ্চ নাটকের হর্তাকর্তা। কী অদ্ভুত এক আন্তঃসম্পর্ক। আরেকটি দিক গুরুত্বপূর্ণ। বাজার-অর্থনীতির নির্মমতায় প্রতিটি ব্যক্তিমানুষকে রাষ্ট্র আর কর্পোরেট আধিপত্য মিলিটারি বলপ্রয়োগ কিংবা মিডিয়া নির্মিত সম্মতি আদায় করে অক্রিয় রাখতে চায়। যারা টিকতে না পেরে অসহ্য যন্ত্রণা থেকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করে না, জ্বলে ওঠে আগুন হয়ে, কিংবা আত্মসমর্পণ করে ধর্মে– তারা হয় সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গিবাদী, সর্বহারা কিংবা উপজাতি। যে রাষ্ট্র এদের তৈরি করে, সেই রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী-পুলিশবাহিনী-র‍্যাববাহিনী কিংবা অন্য কোনো বাহিনী তাদের গুলি করে মারে বিনাবিচারে, *প্রথম আলো* তাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর জেহাদ জারি রেখে এই হত্যাযজ্ঞকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে দেয় না।[৩] দেয় না কেননা কর্পোরেট স্বার্থ তার বিজ্ঞাপন স্বার্থ। তার ব্যবসায়িক পার্টনারের স্বার্থ। অসম সমাজ টিকিয়ে রেখে 'জঙ্গি'বিহীন পৃথিবী বানানো যায় না, যায় না বলেই সেনাবাহিনী-র‍্যাব লাগে এদের দমন করবার জন্য। আর এই দমন-নীতিকে ন্যায্য হিসেবে নির্মাণ করবার জন্য দরকার হয় মিডিয়া। এই হলো মার্কেট-মিডিয়া-মিলিটারি ঐক্য। *প্রথম আলো* সে ঐক্যের স্বঘোষিত পার্টনার। তার কাছে কী শপথ নেব আমি? কেন শপথ নেব?

আমাদের জাতিরাষ্ট্র কই? *প্রথম আলো* কেন আমাদের দেখভালের দায়িত্ব নিলো?

এতোক্ষণ যে-আলাপ হয়েছে তাতে দেখা গেলো গণিত-ভাষা-সাহিত্য-রাজনীতি-রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতি-দেশপ্রেমের দায়দায়িত্ব নিতে নিতে আজ এসে বদলে দেবার এবং বদলে যাবার দায়দায়িত্ব নিয়ে *প্রথম আলো* আমাদের কাছে শপথ করিয়ে নিতে চাইছে ছুরি আর চাইনিজ কুড়াল ঠেকিয়ে। অথবা বলতে পারি ছুরি কিংবা চাইনিজ কুড়ালের মতো ধারালো নিও লিবারাল শপথ করিয়ে নিতে চাচ্ছে। তার শপথ-লোগোতে অস্ত্রের প্রতিকী উপস্থাপন আমাদের কি এই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দেয় যে, এ শপথ করতেই হবে!

রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী বাহিনীর দৃশ্যমান অস্ত্র আর *প্রথম আলোর* মতো কর্পোরেট মিডিয়ার নির্মিত প্রতীকী অস্ত্র মিলে যে যাত্রা শুরু করেছে আজ সেটা ওই নিও লিবারাল দুনিয়ার পথে *এসো বাংলাদেশ গড়ি* গাড়ি নিয়ে যাত্রা-পর্বেরই বিকশিত রূপ। এইসব প্রপঞ্চ আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের অবস্থা। আধুনিক

জাতিরাষ্ট্র আমাদের সাথে সামাজিক চুক্তির অঙ্গীকার করে আমাদের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা হয়ে চেপে বসেছিলো। তারপর থেকে বলপ্রয়োগ আর সম্মতি আদায়ের মাঝ দিয়ে আমাদের উপর কর্তৃত্ব জারি রেখে শাসন করে যাচ্ছে এতোদিন ধরে, নিরঙ্কুশভাবে। আজ আধুনিক জাতিরাষ্ট্র প্রকাশ্যে সামাজিক চুক্তি অস্বীকার করে আমাদের দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছে কর্পোরেশনগুলোর হাতে। সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী ও সম্মতি উৎপাদনকারী বাহিনী। জাতিরাষ্ট্র আজ কর্পোরেট পুঁজির তাঁবেদার, দুনিয়াজোড়াই বলতে গেলে। ল্যাটিন আমেরিকার প্রশ্নটা বিবেচনার বাইরে রেখে বলছি। যে-জাতিরাষ্ট্র আমাদের দেখভালের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবার অঙ্গীকার করবার বিনিময়ে আমাদের উপর সাবর্ভৌম ক্ষমতা হয়ে চেপে বসেছিলো সেই জাতিরাষ্ট্রের পক্ষে অঙ্গীকার রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-সাহিত্য-রাজনীতি কেমন হবে সেটা আজ নির্ধারণের দায়দায়িত্ব নিয়েছে শক্তিশালী পুঁজিবাদী কেন্দ্রস্থ রাষ্ট্র আর তাদের কর্পোরেশনগুলো, *প্রথম আলো* সেই কর্পোরেট পুঁজির তাঁবেদার বলে সেই দায়িত্ব দেখাশোনা করছে। মসৃণ নিও লিবারাল দুনিয়ার পক্ষে শপথ কিংবা অঙ্গীকার করাতে চাইছে।

দেশেপ্রেমের কথা বলে, সার্বভৌমত্বের কথা বলে *প্রথম আলো* কেন জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতায় ভাগ বসাতে চায় কর্পোরেট একটি পত্রিকা হয়ে? এর উত্তর আমরা জানি। বহুজাতিক নিরঙ্কুশ বাজারের এই যুগে জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণা একটি ভুয়া ধারণা। একটা মিথ। এই মিথ ভাঙতে হবে। একদিকে মুক্তিযুদ্ধের মতো একটা বিশাল জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই জাতিরাষ্ট্রকে আমাদের প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে কেন তারা আমাদেরকে কর্পোরেশনগুলোর কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। অপর দিকে এই জাতিরাষ্ট্রের মাঝে জারি থাকা যাবতীয় বলপ্রয়োগ ও অন্যায্যতার জন্য রাষ্ট্রকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করতে হবে। এটাই আমাদের এই মুহূর্তের কর্তব্য বলে আমি মনে করি। শপথ বা অঙ্গীকার হয়ে উঠুক ব্যক্তিমানুষের নিজের দায়। জনতার কাজ হোক সবাই মিলে যৌথভাবে স্বাধীন স্বাধীন সংগঠন গড়ে তুলে *প্রথম আলো*-সহ রাষ্ট্র অন্যান্য গণমাধ্যম, আধিপত্যশীল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ-- সবার কাছে শপথের ব্যানার নিয়ে যাওয়া। ওদেরকে শপথ করতে বলা। ভালো কাজের শপথ। রাষ্ট্র-পরিচালন-পদ্ধতি নিয়ে তাদেরকে মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা।

চ্যানেল আই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা বলেন, *বদলে যাও বদলে দাও* কর্মসূচির মূল কথা কেউ বদলে দেবে এবং কেউ বদলে যাবে। তারমানে তিনি স্পষ্ট করেই বোঝাতে চাইছেন, বদলে দেবার দায়িত্ব *প্রথম আলো* গং-এর আর আমাদের দায়িত্ব নিজেকে সেই মোতাবেক বদলে ফেলা। *প্রথম আলো* গং আপনার কাছে সেই অঙ্গীকার/শপথই নিতে এসেছে আজ। তার মানে কর্তাগিরি করবে *প্রথম আলো*। আর সেই মোতাবেক আমরা বদলে যাব। জনগণকে অক্রিয় রাখবার, তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে রাখবার জ্ঞানগত ঐতিহাসিক পরম্পরা রক্ষা করলেন ফরিদুর রেজা।

সিভিল-মিলিটারি-কর্পোরেট গণতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রচার করা, আরও নির্দিষ্ট করে বললে নিও লিবারাল বাজারের সপক্ষের মতাদর্শ প্রচার করা *প্রথম আলোর* কাছে তাহলে কি আমরা আমাদের অঙ্গীকার বেচে দেব? আসুন আমরা বলি আমাদের অঙ্গীকার আমরা *প্রথম আলোর* কাছে বিকিয়ে দেবো না। আমরা আমাদের অঙ্গীকারগুলোকে সযতনে বাঁচিয়ে রাখব রাষ্ট্র আর কর্পোরেশনের হাত থেকে। বদলে যাবার এবং বদলে দেবার; মানে নতুন পৃথিবী গড়বার, মানে স্বৈরতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অন্যায্য কর্তৃত্বের বাজারের যুগের অবসান ঘটিয়ে প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের মুক্তির পক্ষের সমাজের দিকে আমাদের অঙ্গীকারকে আমরা পরিচালিত করবো। পরিচালিত করবো নিজের বোধ আর বিচার দিয়ে। অঙ্গীকার করবো নিজেরই কাছে। শুধু *প্রথম আলো* নয়, রাষ্ট্র-কর্পোরেশন-সহ যেকোনো কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজের অস্তিত্ব আর শপথকে আমরা সঁপে দেবো না-- এই উচ্চারণে প্রকম্পিত হোক আমাদের এই জনপদের সমস্ত পরিমণ্ডল।

টীকাভাষ্য

১. দেখুন বাধন অধিকারী, 'এসো বাংলাদেশ গড়ি/সেনা কর্পোরেট কর্তৃত্বের গাড়িতে চড়ে বাংলাদেশের নিও লিবারাল দুনিয়ায় ভ্রমণপর্ব', *সাগ্নিক*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, তৈমুর ফারুক তুষার সম্পা. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

২. আমার ৪র্থ বর্ষের একাডেমিক গবেষণার বিষয় ছিল '২০০৭ এর আগস্টের ছাত্র-বিক্ষোভ: জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদকীয় পাতার ভিত্তিতে মূলধারার গণমাধ্যমের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানের উপর একটি পর্যালোচনা'। গবেষণার সিদ্ধান্ত থেকে এটা স্পষ্টতর প্রতীয়মান হয়েছে *প্রথম আলো* বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ছাত্র-বিক্ষোভকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্তত পক্ষে, দেশের সেনা-কর্পোরেট সেই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নেয়নি, ভয়ে এবং অতি-অবশ্যই মতাদর্শিক জায়গা থেকেও।

৩. প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দেখুন তানজিনা ফেরদৌস ও বাধন অধিকারী, 'নিও লিবারাল দুনিয়ায় সন্ত্রাসবাদের বীজ ও আমাদের লড়াইয়ের প্রশ্ন।' *ইউকে বেঙ্গলি*, প্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন পত্রিকা। http://ukbengali.com/Literature/Features/Fea20081225-Tanzina-Taisin-Badhon-Adhikari-on-Neo-liberalism-and-Terrorism.htm

অসময়ের কাগজ; ২০১০

শ্রমিক আন্দোলন ও মূলধারার মিডিয়া: গার্মেন্টস শ্রমিকের অধিকার আন্দোলন যখন *প্রথম আলো*র নৈরাজ্য

শ্রম। ম্যাক্সিম গোর্কি যাকে দেখতেন পৃথিবীর শুদ্ধতম একক হিসেবে। শ্রমিক হলেন সেই শুদ্ধতম এককের স্রষ্টা। ব্যক্তিমালিকানার ধারণা বিকশিত হবার পর থেকে এই শ্রমিকদের শোষিত উদ্বৃত্ত শ্রম থেকেই সম্পদের পাহাড় গড়েছে আজকের এই বড়লোক শ্রেণী। শ্রম-শোষণের ধারা-প্রবণতা স্থিতিশীল কিছু না। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সেক্টরে এই শ্রম শোষণের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের সহজাত মুক্তিমুখীন প্রবণতাকে প্রশ্নাতীত করতেই যেন বিভিন্ন দেশে লড়েছে শ্রমিক শ্রেণী। হেঁটেছে দাবি আদায়ের মিছিলে। সেই লড়াইয়ের অর্জন যে নেই সেটা কিন্তু কখনও বলা যাবে না। এই যেমন আঠারো শতকের শ্রমিক আর আজকের শ্রমিক এক নয়। মে দিনের রক্ত ঝরার মাঝ দিয়ে সংগ্রামের যে ঐতিহাসিকতা শুরু; একুশ শতকে এসে শ্রমিক আদায় করেছে তার অনেক দাবি-দাওয়া। একটু একটু করে। কিন্তু মার্কস কথিত প্রাগৈতিহাসিক কাল শেষ হয়নি আজও। শুরু হয়নি মানুষের ইতিহাস। কেননা শেষ হয়ে যায়নি উদ্বৃত্ত শোষণের কাল। শুধু পরিবর্তন এসেছে তার মাত্রায়। মুক্ত মানুষদের মুক্ত শ্রমের যৌথ সমাজ প্রতিষ্ঠা পায়নি আজও। বরং প্রাযুক্তিক অগ্রগতি আর তার মালিকানার সামাজিকীকরণ না ঘটার জন্য শ্রমিকের অসহায়ত্ব বেড়েছে বলতে হবে আগের থেকে। উৎপাদনে জীবন্ত শ্রম অর্থাৎ শ্রমিকের হাত-পা-এর থেকে মৃত শ্রম তথা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে আগের থেকে। এটা হবার কারণে উৎপাদনী খাতে কমেছে কর্মসংস্থান। আর একই সাথে অনেক বেশি শ্রমিক সংগঠিত হবার শর্তও সেই আগের মতো নেই। কেননা অর্ধেক শ্রমিকের কাজ এখন ২/১টা প্রযুক্তিই করতে পারে। কিন্তু গার্মেন্টস কারখানাকে সরলীকৃতভাবে এই ধারণার ছাঁচে ফেলে বিচার করা যায় না। সেখানে অনেক অনেক শ্রমিক কাজ করে। অনেক অনেক শ্রমিকের জীবন্ত শ্রমের প্রয়োজন মেটানোর মতো প্রযুক্তি আবিষ্কার করা যায়নি আজও। সেখানে জীবন্ত শ্রমের প্রয়োজন পড়ে। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য শয়ে শয়ে শ্রমিক কাজ করে সেখানে। স্বভাবতই শ্রম-শোষণও আছে সেখানে। ইতিহাসের এই পর্যায়ে এসে সেই শ্রম-শোষণের মাত্রা কতটুকু আর কতটুকু রাখতে চান আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের ম্যানেজাররা, এবং কেন রাখতে চান – সেটা বিচার করে দেখবার প্রয়াস এই প্রবন্ধের মাঝে থাকবে। কিন্তু মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হলো মূলধারার মিডিয়া হিসেবে *প্রথম আলো*র সাথে এর সম্পর্ক-বিচার।

এটা করতে গিয়ে আমি সাম্প্রতিক গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের উপর *প্রথম আলো*র কাভারেজ বিচার-পূর্বক সেই কাভারেজের সঙ্গে ক্ষমতাসম্পর্কের অপরাপর সেক্টরগুলোর কী সম্পর্ক বিরাজ করে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে কেন মিডিয়া বিবেচিত হয় তার একটা তত্ত্বতালাশ করবার চেষ্টা করব।

এজন্য আমি বেছে নিয়েছি *প্রথম আলো* থেকে এর 'শ্রমিক অসন্তোষ'- সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনার ধরন, সম্পাদকীয়, বিজ্ঞাপন। সেখান থেকে আমরা দেখতে চেষ্টা করব

শ্রমিকদের বিপরীতে *প্রথম আলোর* অবস্থান কী এবং কীভাবে অপরাপর মূলধারার গণমাধ্যমের অবস্থানও কমবেশী একই হতে বাধ্য। বলে নেয়া দরকার যে এই রচনা মিডিয়া কথিত এই 'শ্রমিক অসন্তোষ' যা আমাদের কাছে স্পষ্ট চেহারার শ্রমিক আন্দোলন – সেই আন্দোলনের সংগঠন, এ্যাকটিভিজমের ব্যাখ্যা ভবিষ্যতের রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্য নয়। এটি অর্থশাস্ত্রের একটি গভীরতর পর্যবেক্ষণও নয়। সে সাধ্য আমার নেই। এটি কেবলই একটি মিডিয়া পর্যবেক্ষণ।

গার্মেন্টস শিল্প এমন এক শিল্প – বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন যার উপর দাঁড়িয়ে আছে। মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭৬ ভাগ আসে এই খাত থেকে। এখানে কাজ করে হাজার হাজার শ্রমিক। কর্পোরেট মিডিয়ার আড়াল করতে চাওয়া – কিন্তু

প্রথম আ
পোশাক শ্রমিকদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ

অসচেতন ফাঁস করে দেয়া তথ্যকে[১] একটু বিশ্লেষণে নিলেই টের পাওয়া যায় – এই শিল্পে উদ্বৃত্ত শোষণের মাত্রাটা কী রকমের। আসুন পাঠক, দেখি ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ০৬ থেকে ২ মার্চ ০৬ এই তিনদিনে ৩টি সরেজমিন প্রতিবেদন ছেপেছিল *প্রথম আলো* – গার্মেন্টস শিল্পের উপর। মনে করিয়ে দিই পাঠককে, আবার হয়ত অন্য কাজে পুনরুল্লেখও করব যে সত্য কথাটির সেটি হলো এই যে প্রতিবেদন জায়গা করে নিলো *প্রথম আলোর* পরিসরে; এর প্রথম পাতায় তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে ছিলো ফিনিক্স নামের গার্মেন্টস কারখানায় পুড়ে মারা যাওয়া ৩ জন মানুষ। হ্যাঁ, এই মূল্যই পরিশোধ করতে হয়েছিলো শ্রমিকদের; দেশের প্রধানতম জাতীয় দৈনিক, 'যা কিছু ভালো তার সঙ্গে' থাকা *প্রথম আলোতে* জায়গা পেতে। বলছি এই কারণে যে বছরজুড়ে গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের অসহায়ত্বের কোনো খবর ছাপা হয় না এই কর্পোরেট মিডিয়াতে। জায়গা হয় না তাদের। মরার পরে এই জায়গাটুকু পেলো তারা। ইস্, মারা যাক আরও আরও শ্রমিক! তবু খণ্ডিত[২] ভাবে হলেও ছাপা হোক ২/৪টা খবর। জানুক *প্রথম আলোর* লক্ষাধিক 'সুশীল' পাঠক– কী নির্মমভাবে বেঁচে আছে কিংবা কী নির্মমভাবে মরে যাচ্ছে এত এত মানুষ! যাক্, মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মূল কথা ছিলো গার্মেন্টস শিল্পে উদ্বৃত্ত শোষণের মাত্রাটা কেমন– সেটার খোঁজ করা। ২রা মার্চ ০৬ তারিখের *প্রথম আলোর* সরোজমিন প্রতিবেদন তিন। সেখান থেকেই জানতে পারি,'বাংলাদেশ থেকে একটি শার্ট ক্রেতারা কেনেন ২ মার্কিন ডলারে। আর যুক্তরাষ্ট্রে সেটি বিক্রি হয় ২০ ডলারে'।

আসুন পাঠক, এবার একটু বুঝতে চেষ্টা করি এই বাক্যটির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মালিক-শ্রমিক-প্রভুদের অবস্থান।

কারা কেনে ঐ তৈরি পোশাক? কেনে তারাই যারা ঐ পোশাক শিল্পের প্রকৃত মালিক। *প্রথম আলো* আড়াল করতে চায় ঐ বিদেশী প্রভুদের। একবারও দেখায়নি ঐ প্রভুদের সাথে এই শোষণ-ব্যবস্থার সংযোগ। পাঠক, আপনি যদি বাংলাদেশের অর্থনীতির ন্যূনতম খোঁজখবর রাখেন; তাহলে আপনিও বোধকরি জানেন যে, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আদতে একটি বেচা-কেনার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখানে কাপড়-সুতা সবই বিদেশী মালিকদের সস্তা শ্রমের জন্য শকুনির মতো দৌড়ে বেড়ানো পুঁজির। এখানে যারা মালিক বলে বিবেচিত হয় তারা আদতে শুধু ঐ ব্যবস্থাপনারই মালিক। তারা হলো ঠিকাদার। আনু মুহাম্মদ গার্মেন্টস এর মতো শিল্পগুলি নিয়ে বলতে গিয়ে অনেককাল আগে বলেছেন,

> এসব শিল্প আমদানি বিকল্পও নয়, আমদানি পরিপূরক। এসব শিল্পের যা কিছু উপকরণ ডিজাইন সবই আমদানি করতে হবে। শুধু তৈরি বা সংযোজন হবে এদেশে, বস্তুতঃ এগুলো ঠিকাদারী কাজ। সস্তা শ্রমশক্তির কারণে এদেশে এগুলোর উৎপাদন ব্যয় কম পড়বে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিশ্ব শ্রম- বিভাজনের পরিকল্পনা অনুযায়ী এসব শিল্প কখনও থাইল্যান্ড তাইওয়ান বা কখনও বাংলাদেশে স্থাপিত হয়। এসব শিল্পের স্থায়িত্ব, বিকাশ সবই আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। মৌলিক শিল্প হিসেবে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। [আনু মুহম্মদ ১৯৯২]

গার্মেন্টস শিল্পকে আসলে আদতেও শিল্প বলা যায় কিনা সে নিয়ে সংশয় আছে। অর্থশাস্ত্রের সাথে আমাদের মধ্যে যাদের সাধারণ পরিচিতি আছে তারা সবাই জানি, বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ কৃষিপ্রধান খাত থেকে সরাসরি সার্ভিস-প্রধান খাতের দিকে মোড় নিয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে বলিষ্ঠ সব পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে তুলনা করলে তাই একটি স্পষ্টতর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অপরাপর পুঁজিবাদী দেশে অর্থনীতিতে কৃষিখাতের হাত ধরে শিল্পখাত বিকশিত হয় আর এই শিল্পখাতের অনুষঙ্গ হিসেবে বিকশিত হয় সার্ভিস-প্রধান খাত। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্পখাতের বিকাশের অনুপস্থিতিতে সার্ভিস-প্রধান খাতের বিকাশ এদেশের অর্থনীতিকে করেছে বৈদেশিক সাহায্য কিংবা বৈদেশিক ঋণের মুখাপেক্ষী। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যায়। কম্পিউটার সফট্ওয়্যারের উৎপাদন তাদের একটি বড় ধরনের শিল্পখাত। আর এরই ধারাবাহিকতায় সেখানে বিকশিত হয়েছে কম্পিউটারের বিভিন্ন সার্ভিস খাত। কিন্তু তাদের বাইরের দেশ থেকে সফট্ওয়্যার আমদানির খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না কেননা ঐ শিল্পখাত বিকাশের পরেই তারা সার্ভিস খাতকে বিকশিত করেছে। অপরদিকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একই ঐ কম্পিউটার-সার্ভিস খাতের জন্য বিপুল পরিমাণে সফট্ওয়্যার আমদানির প্রয়োজন পড়ে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। গার্মেন্টস শিল্পও আসলে এক অর্থে ঐ সার্ভিস-প্রধান খাত। এদেশে বস্ত্রখাত-সুতাখাত বিকাশের পর যদি গার্মেন্টস খাত বিকশিত হতো তবে কিন্তু অর্থনীতির চেহারাটা এমন থাকত না। এদেশের অগণিত শ্রমিকের; বিশেষত নারী শ্রমিকের সস্তা শ্রম শোষণের নিমিত্তে ছুটে আসা কর্পোরেট পুঁজি– এই শিল্পের বাহক। এদেশে যারা মালিক বলে বিবেচিত

তারা আসলে শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনার মালিক। ওরা কাপড়-সুতার জন্য পুঁজি যোগাতে থাকে, নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্ডার দিয়ে থাকে, দিয়ে থাকে বিভিন্ন শর্ত। সেই পুঁজি-অর্ডার-শর্ত মেনে তবেই চলে গার্মেন্টস-এর উৎপাদন।

আসুন তবে এবার একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজবার চেষ্টা করি। ২ টাকায় কিনে ২০ টাকায় বিক্রি করে যারা, তাদের কাছে কেন তৈরি পোশাকের এই অবাধ চাহিদার যুগে আমরা পণ্য বিকোবো। উত্তর উপরের আলোচনার মাঝে নিহিত। যার পুঁজি তার শর্ত না মানলে আমি তো পোশাক বানাতেই পারব না। সুতরাং যা বলে ওরা তা শুনতে হবে। পরিষ্কার বাংলা কথা। তাহলে তো এটা পরিষ্কার হলো যে বাংলাদেশে যারা মালিক বলে বিবেচিত তারা আদতেও মালিক না। একেবারে ঠিকাদার। মধ্যস্বত্বভোগী। আসল মালিক ঐ ক্রেতারাই। তাহলে *প্রথম আলো* যখন মালিক-শ্রমিকের জীবনযাপনের পার্থক্য তুলে ধরছে তার প্রতিবেদনে 'মালিকের বিলাসবহুল জীবন....' এই শিরোনামে তখন কোথায় থাকে ঐ বিদেশী মালিকের কথা? কেন মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া বুর্জোয়া পর্যন্ত গিয়েই কর্তব্য শেষ করে *প্রথম আলো?* আসুন বন্ধু, আমরা দেখতে চেষ্টা করি কী বলেছে *প্রথম আলো?* কী তার অবস্থান এই 'শ্রম অসন্তোষের' বিপরীতে। সচিত্র প্রতিবেদনের ঐ তিনটি ধারাবাহিক কিস্তিতে চোখ মেলে আমরা দেখতে পাই –

১ম প্রতিবেদন : কারখানার পরিবেশের উপর
২য় প্রতিবেদন : মালিকের ভোগ-বিলাসের জীবন আর শ্রমিকের অসহায়ত্বের উপর
৩য় প্রতিবেদন : কারখানার কাজের পরিবেশ, মজুরি, কমপ্লায়েন্স-এর উপর

এই তিন প্রতিবেদনে *প্রথম আলো* যে অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরেছে সেগুলো ঐ কমপ্লায়েন্স-এর উপর ভিত্তি করেই। গার্মেন্টস শিল্পকে তারা মেপেছেন ঐ কমপ্লায়েন্সের ভিত্তিতেই। *প্রথম আলোর* প্রতিবেদনেই বলা আছে যে, ঐ কমপ্লায়েন্স হলো 'দাতা'দের[৩] বেঁধে দেয়া শর্ত। যা মানলে তারা বাংলাদেশের তৈরি পোশাকগুলো কিনবে। সোজাসাপ্টা কথা হলো বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে বিনিয়োগ করবে। ঐ প্রতিবেদন থেকেই জানতে পারি, দাতারা কমপ্লায়েন্সের বিষয়টিকে প্রথম সামনে নিয়ে আসেন ১৯৯৫ সালে। দাতাদের কাছে এর অর্থ হলো –

১. আন্তর্জাতিক শ্রম আইন মেনে চলা
২. শ্রমিক সংগঠন করার অনুমোদন
৩. নিয়োগপত্র দেয়া
৪. কাজের সময় ঠিক করে দেয়া
৫. সাপ্তাহিক ছুটি দেয়া
৬. শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা
৭. কারখানাকে নিরাপদ রাখা

পাঠক, *প্রথম আলোর* অবস্থান কিন্তু এই বৃত্তেই। এর বাইরে কিন্তু সে যায় না। দাতাদের ঐ কমপ্লায়েন্স এর সাথে যতটুকু অসঙ্গতি বাংলাদেশের এই তথাকথিত মালিক শ্রেণীর আছে– সেটা নিয়ে কথা বলেই ক্ষান্ত দেয় *প্রথম আলো*। কিন্তু ভেবে দেখুন পাঠক, একটিবার ভেবে দেখুন ঐ সাতটি শর্ত যারা দেয় সেই 'দাতা'রাই আবার ক্রেতা। দাতা হয়ে যারা সাতটি শর্ত দেয় ক্রেতা হয়ে তারাই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ২ টাকায় কিনে ২০ টাকায় বিক্রি করে। অর্থাৎ বাংলাদেশের অগণিত নারী-পুরুষ শ্রমিকের যে সস্তা শ্রম প্রতিদিন চুরি হয়ে যায়– তার বড় অংশটা কিন্তু বাংলাদেশের ঐ তথাকথিত মালিকশ্রেণীর পকেটে যায় না– পকেটে যায় ঐ কমপ্লায়েন্স ওয়ালাদের। বাংলাদেশের ঐ তথাকথিত মালিক শ্রেণী কিন্তু একেবারে মধ্যস্বত্বভোগী। মাঝখানে বসে তারা শুধু চেষ্টা করে যায় যে ২ টাকায় একটি পোশাক সে বিকোবে তার প্রভুদের কাছে সেই দুই টাকার মধ্যে কতটুকু সে বাঁচাতে পারে শ্রমিককে দেবার পর। *প্রথম আলোর* যত রাগ তা কিন্তু এই দুই টাকার মধ্যে বাঁচাতে চাওয়া তথাকথিত মালিক তথা এই দেশীয় ম্যানেজারদের উপর। ৩টি প্রতিবেদনেই ঐ রাগের প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু ঐ রাগে অনেক কিছুই আড়ালে থেকে যায়। মালিকের ভোগবিলাসের জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে *প্রথম আলো* যখন এদেশীয় ঐ ম্যানেজারের জীবন-যাপন-পদ্ধতি উপস্থাপন করেন তখন আড়ালে থেকে যায় আসল মালিকের জীবন-যাপন-পদ্ধতির খবর। এদেশীয় মালিকের শোষণের কথা যখন বলে *প্রথম আলো* তখন আড়ালে থেকে যায় ঐ আসল মালিকের বিশাল শোষণের খবর। আরও কথা আছে। ঐ যে এদেশীয় মালিক শ্রেণীর উপর রাগের কথা বলা হলো সে রাগও পানি হয়ে যায় যখন বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। হ্যাঁ, পাঠক। দেখুন, ২৩ মে ০৬ তারিখের *প্রথম আলোর* ৭ নং পৃষ্ঠা। অর্ধেক পৃষ্ঠা জুড়ে এফ এস সোয়েটার্স লিমিটেড, এস কিউ গ্রুপের বক্তব্য ছেপেছে *প্রথম আলো– সম্প্রতি গাজীপুরে এফ এস সোয়েটার্সে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর উপর সঠিক প্রতিবেদন* শিরোনামে। এই প্রতিবেদন কিংবা বিজ্ঞাপনে (এটি এফ এস সোয়েটার্সের দিক থেকে একটি প্রতিবেদন হলেও *প্রথম আলোর* কাছে কিন্তু একটা বিজ্ঞাপন। কেননা টাকা দিয়েই এটি ছাপা হয়েছে ৫ এর পাতায়।) এফ এস সোয়েটার্স স্পষ্টভাবে অভিযোগ করেছে,

> গত ২০শে মে শনিবার গাজীপুরে এস কিউ গ্রুপের এফ এস সোয়েটার্সে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর উপর দেশের বিভিন্ন প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রিপোর্টিং সঠিক তথ্য নির্ভর না হওয়ায় শুধু এস.কিউ ই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পোশাক শিল্প রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ইমেজ।

প্রতিবেদনের শেষে এফ এস সোয়েটার্স দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোকে সঠিক ও যথার্থ তথ্যনির্ভর রিপোর্টিং করবার জন্য অনুরোধ করেছেন।

এরপর স্বভাবতই আমরা আশা করেছিলাম, *প্রথম আলো* লাফিয়ে উঠবে। যেমন চিৎকার করে বলেছিলো, বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি নয় তেমনি চিৎকার করে বলবে যে,

না, তোমরা ঠিকঠাক বেতন-ভাতা দাও না। তা করেনি *প্রথম আলো?* কেন করলনা? কেন সরব হয়ে উঠলনা? তবে কি মিডিয়া সত্যিকার অর্থেই মিথ্যা প্রতিবেদন ছেপেছিল? তবে কি সত্যিই তথ্যনির্ভরতা ছিল না ঐ প্রতিবেদনগুলোতে? নাকি এর প্রতিবাদ না করবার কারণ ঐ বিজ্ঞাপন। কত টাকা পেয়েছিলো *প্রথম আলো* আমরা জানি না। তবে এটা তো ঠিক যে, দেড় লাখ সুশীল পাঠকের মাথায় এই ধারণা গেঁথে গিয়েছিলো যে, *প্রথম আলো*রা ঠিকঠাক নিউজ করেনি? তবে বুঝি গার্মেন্টস মালিকেরা ঠিকঠাক বেতন ভাতাই দেয়। পত্রিকাগুলোই মিছেমিছি বলে যে তারা ঠিকঠাক বেতন ভাতা দেয় না।

হ্যাঁ পাঠক, এই হলো কর্পোরেট মিডিয়া। এই হলো বাজারের যুগ। সমস্ত নৈতিকতা, সমস্ত আবেগ যখন চড়া দামে বিক্রি হয়ে যায় বাজারে। গার্মেন্টস-এ কাজ করা লাখ লাখ নারী-পুরুষ শ্রমিকের নিত্যদিনের অসহায়ত্ব, ক্ষুধার কাতরতা, পুড়ে মরা, তাদেরই মতোন কোনো শ্রমিকের গড়া সুউচ্চ ভবনের ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়া– এগুলো কোনো প্রভাবই ফেলে না সংবাদ-কর্মীর মনে। তাকে প্রতিনিয়ত ছুটতে হয় খালেদা-হাসিনা-শাবনূর-জেমস-দেবপ্রিয়-ডিজুস-সিটিসেল ওয়ালাদের কাছে। আর যদি ফেলেও কোনো প্রভাব তবে চেপে যেতে হয় তার অনেকটাই। কেননা তার প্রকাশক-সম্পাদক তাকে যে বেতন দেয় তা আসে ঐ তাদের বিজ্ঞাপনের টাকা থেকে যারা গার্মেন্টস-এর শ্রমিকদের অসহায়ত্বের জন্য দায়ী।

তবুও আমি মনে করি না এদেশীয় মালিকদের কীর্তি-কারখানা নিয়ে রিপোর্ট করবার ক্ষেত্রে *প্রথম আলো* খুব একটা গড়িমসি করেছে। হ্যাঁ, আসলে এদেশীয় মালিক-শ্রেণী যেমন করে কর্পোরেট-এর ভৃত্য, তেমনি করে আমাদের মিডিয়াও ঐ কর্পোরেটের ভৃত্য (গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য দেখুন: চমস্কি : ১৯৯৭)। সুতরাং কর্পোরেট মালিক শ্রেণীর স্বার্থ আর *প্রথম আলো*র স্বার্থ মিলেমিশে একাকার। এই একাত্মতাই নির্ধারণ করে এদেশীয় মালিকশ্রেণীর সঙ্গে *প্রথম আলো*র সম্পর্কটা কেমন হবে? ঘটনা হলো ঐ কমপ্লায়েন্স। এদেশীয় মালিক যদি কমপ্লায়েন্স মানে তো ভালো। আর যদি না মানে তো তারা খারাপ। আর না মানলে তো অবশ্যই সে কথা রাষ্ট্র করবে *প্রথম আলো*। যেমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ম্যানেজারির দায়িত্বে বসে থাকা সরকার। এই সরকার যদি বহুজাতিক কোম্পানির কথা মতো, বিশ্ব-ব্যাংক-আইএমএফ-এর কথা মতো চলে অর্থাৎ দাতাদের কথা মতো চলে, টাটার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে, আদমজী বন্ধ করে দেয় তো *প্রথম আলো* কিছু বলে না। বা এটাকে ভালো বলে উপস্থাপন করে। কিন্তু সরকার যখন জঙ্গি তৎপরতা দমন করতে পারে না, সর্বহারা দমন করতে পারে না, ঘুষ-দুর্নীতি রোধ করতে পারে না তখন কিন্তু সরব হয়ে ওঠে কর্পোরেট স্বার্থের পত্রিকাওয়ালারা। কেননা বহুজাতিক কোম্পানির অবাধ শোষণের জন্য সর্বহারা-জঙ্গি-ঘুষ-দুর্নীতি-অরাজকতা সবই ক্ষতিকর। তখন তারা অব্যাহতভাবে লিখতে থাকে সরকারের বিরুদ্ধে। ঠিক তেমনি করে কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী যদি কোনো মালিক গার্মেন্টস

শ্রমিকদের সাথে আচরণ না করে তাহলে অব্যাহতভাবে রিপোর্ট করবার কথা তাদের কেননা কমপ্লায়েন্স মেনে চলাটা কর্পোরেট পুঁজির সাথে সংশ্লিষ্ট। কমপ্লায়েন্স না মানলে কিন্তু এমনি করে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তেমনটা আমরা দেখতে পাই না। এ দেশীয় মালিক শ্রেণী যখন কর্পোরেট স্বার্থের কথা মাথায় না রেখে কমপ্লায়েন্স না মেনে শ্রমিকদের সাথে মধ্যযুগীয় আচরণ করতে থাকে তখনও অব্যাহতভাবে আমরা *প্রথম আলোকে* এর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে দেখি না। কেন দেখতে পাই না, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। এর ঠিকঠাক উত্তর আমি জানি না। হবে হয়তো, জায়গা হয় না বিজ্ঞাপনের ভীড়ে, কিংবা ঐশ্বরিয়া-খালেদা-হাসিনা-টেন্ডুলকারের ভীড়ে। আবার এ দেশীয় মালিক শ্রেণীও কিন্তু সেই অডিয়েন্স– যাদেরকে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বেচে দেয় *প্রথম আলো*।[৪] আরও কারণ থাকতে পারে। যেমন গার্মেন্টস-এর এই বেহাল পরিস্থিতি কিন্তু *প্রথম আলোর* ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকর নয়। ক্ষতি হবার সম্ভাবনা তখন, যখন পোশাকখাতে বিনিয়োগ বন্ধ করে দেবে দাতারা। সেটা যেন না হয়, মসৃণভাবে শোষণ চললে তো কোনো ক্ষতি নেই। আর সেজন্যই পত্রিকাগুলোকে লাফিয়ে উঠতে দেখা যায় তখন, যখন ফুঁসে ওঠে শ্রমিকরা। মাথা খারাপ হয়ে যায় তাদের। সেই সময় এসে। এইযে এবারের শ্রমিক আন্দোলন– এখানেও সেটাই দেখা গেলো। 'নৈরাজ্য' থামানোর জন্য উঠে পড়ে লাগল *প্রথম আলো*। সত্যি করেই তারা বলল যে এটাকে ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দেবার কিছু নেই। এটা স্পষ্টতই একটা শ্রমিক অসন্তোষ। গোলটেবিল বৈঠক হলো। কিভাবে এই শিল্পখাতকে বাঁচাতে হবে তার জন্য কলাম পয়দা করলো *প্রথম আলোর* বুদ্ধিজীবীরা। হুলুস্থুল কাণ্ড। কিন্তু কী ছিল এতোসব আয়োজনের লক্ষ্য? আসুন বন্ধু, দেখতে চেষ্টা করি।

প্রথম আলোর কলাম : স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার প্রয়াস

এই যে শ্রম-অসন্তোষ নিয়ে কলামগুলো ছাপা হয়েছে *প্রথম আলোর* পাতায়– সেগুলোর কোনোটাতেই ঐ আসল মালিকের টিকিটি পর্যন্ত ধরবার চেষ্টা করা হয়নি। আমি একটি প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা তুলব। পাঠক বন্ধু, আপনি সেটির সাথে অন্যগুলিকে মিলিয়ে নিতে পারেন। ২৪ মে ০৬-তে *মালিক শ্রমিকের জন্য জরুরি বার্তা* নামে বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মঞ্জুর এলাহীর প্রতিক্রিয়াটি নিয়ে আলাপ করছি।

এলাহী শুরু করেছেন এভাবে,

'রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সবচেয়ে বড় দরকার দেশের ভাবমূর্তি' হ্যাঁ বন্ধু, এই ভাবমূর্তি রক্ষা করাটাই মূল কথা। শ্রম-শোষণ হোক, পুড়ে মরুক শ্রমিক, কিংবা চাপা পড়ুক, তাতে কিছু যায় আসে না। সেটা বোঝা যায় আরেকটু নিচে এলেই। বলেছেন তিনি দু'দিন ধরে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে সেগুলো নিয়ে আমি খুবই শঙ্কিত...'। লক্ষ্য

করে দেখুন পাঠক, এলাহী বলছেন, দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে দু'দিন ধরে। প্রতিদিনের শ্রমিকের সস্তা শ্রম-শোষণ দুঃখজনক নয়।

নিয়ম করে তার উপর যৌন নিপীড়নের ঘটনাও দুঃখজনক নয়। দুঃখজনক নয় প্রতিনিয়ত চাপা পড়া আর পুড়ে মরা। দুঃখজনক তবে কী? হ্যাঁ, দুঃখজনক হলো অন্দোলন। দুঃখজনক হলো অসন্তোষ। তার আগে গার্মেন্টস শিল্পের আর কোনো দুঃখজনক ঘটনার আখ্যান বর্ণনা করেন না এলাহী। প্রবন্ধ লেখেন না *প্রথম আলো*র পাতায়। পাঠক, ভাবুন তো একটিবার! একটিবার ভাবুন তো, এই শঙ্কা তবে কার জন্য– যে শঙ্কার কথা এলাহী বললেন প্রবন্ধের শুরুতে। শঙ্কা তবে মালিকের জন্য। শিল্পের জন্য। শিল্প রক্ষা মানে মালিক রক্ষা। আচ্ছা, তারপর কি দেখলাম প্রবন্ধে? দেখলাম তিনি ভালো মালিক-খারাপ মালিক তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন। বলেছেন তিনি, 'দেশে যেসব শিল্প-কারখানাগুলো অছে, সেগুলোর মধ্যে ভালো খারাপ দুই ধরনের কারখানাই আছে, দুই ধরনের মালিকই আছে'। পাঠক, মাথায় রাখুন এই ভালো-খারাপ তত্ত্ব তিনি কিন্তু প্রণয়ন করছেন ঐ কমপ্লায়েন্সের উপর ভিত্তি করেই। 'দাতা'দের কমপ্লায়েন্স। যে কমপ্লায়েন্স-ওয়ালাদের চরিত্র *প্রথম আলো*রই কল্যাণে আমরা উন্মোচন করেছি প্রবন্ধের শুরুর দিকে।

মালিক ও শ্রমিকদের জন্য জরুরি বার্তা

এরপর এলাহী বলেছেন আইনের কথা। মালিক-শ্রমিক সবাইকে তিনি মানতে বলেছেন আইন। কিন্তু কার জন্য এ আইন? সেনা নামাতে বলেছেন মালিকেরা। কী করবে সেই সেনারা? আইন রক্ষা করবে? শ্রমিকদের প্রতিহত করবে? কার জন্য তবে এই সেনা নামানো?

যা হোক, টিকিয়ে রাখার ব্যাপারটাই প্রাধান্য পেয়েছে তার রচনায়। পোশাক শিল্পকে টিকিয়ে রাখা। ভাবমূর্তি নষ্ট না হতে দেয়া। শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতি তার অনুরোধ, 'আপনারা আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। কারখানাটিকে মনে করবেন একটি বৃক্ষ। যে বৃক্ষটির যত্ন নিলে তার ফল আপনিও উপভোগ করতে পারবেন।'। কিন্তু এ

এক জঘণ্য প্রতারণা। কারখানা বৃক্ষ নয়। বৃক্ষ রোপণ করা হলে তা আপনাআপনিই স্বতস্ফূর্তভাবে বেড়ে উঠতে পারে। সে স্বাধীন সত্তা এই অর্থে। কারখানা আর মালিকের বাপেরও শক্তি নাই যে সে শ্রমশক্তি ছাড়া স্বাধীনভাবে টিকে থাকতে পারে। শ্রমিকের শ্রমশক্তি ছাড়া কারখানা চলতে পারে না। এ আমরা সবাই জানি। সুতরাং মামলাটা কারখানার নয়। মামলাটা শ্রমিকের। কারখানা যদি বৃক্ষ হয়ও তবু সে বন্ধ্যাই থাকে শ্রমশক্তি ছাড়া। ফল ধরে ঐ শ্রমশক্তিতেই। তাই কারখানাকে বৃক্ষ ধরে নিয়ে শোষণ-সম্পর্ককে টিকে থাকতে দেয়াটা শ্রমিকের কাজ হতে পারে না। ওটা এলাহীদের কাজ। যারা আড়াল করতে চায় শোষণ-সম্পর্ক। আড়াল করতে চায় এই চরম সত্য কথাটি যে, কারখানা না থাকলে শ্রমিকের যতখানি ক্ষতি– তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি মালিকের। যার শ্রম-শক্তি ব্যয় করে মূল্য তৈরির অভ্যাস নেই। কেবল সস্তা শ্রম-শোষণ করে মজুরের উৎপাদিত বাড়তি মূল্যই যার পেট মোটা করে। আর পুঁজির ধর্মই হলো

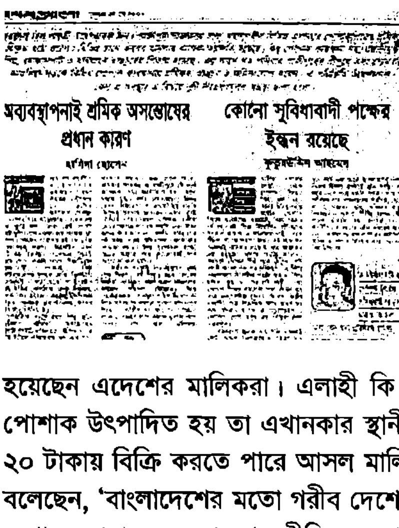
অব্যবস্থাপনাই শ্রমিক অসন্তোষের প্রধান কারণ

কোনো সুবিধাবাদী পক্ষের ইন্ধন রয়েছে

নিজেকে স্ফীত করবার চেষ্টা। মার্ক্সের সুবাদে আমরা জানি। সেই স্ফীত করবার কাজটি তখনই কেবল ঘটে যখন ঐ পুঁজি বিনিয়োজিত হয়। শ্রম-শক্তি প্রয়োগ করা হয় সেই পুঁজির উপর। কাজেই কারখানা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার পরামর্শ দিয়ে শ্রমিকদেরকে ভয় দেখান এলাহী। এলাহী কি জানেন না, একেবারে বসে বসে মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে এই কারখানাগুলোর মাধ্যমেই বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন এদেশের মালিকরা। এলাহী কি জানেন না এই সেই কারখানা যেখানে, যে পোশাক উৎপাদিত হয় তা এখানকার স্থানীয় মালিকের মুনাফার পরেও ২ টাকায় কিনে ২০ টাকায় বিক্রি করতে পারে আসল মালিকেরা। সেই কারখানা বন্ধ হবে কেন? মঞ্জুর বলেছেন, 'বাংলাদেশের মতো গরীব দেশে, যেখানে বেকারত্বের হার অনেক বেশি এবং যেখানে আমাদের সম্পদ খুব সীমিত, সেখানে যদি কারখানায় আগুন দেয়া হয় তবে তা হবে মরার উপর খাড়ার ঘা'। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমের চাহিদা থাকেই। থাকতে বাধ্য। কারখানা পোড়ালে মালিকের ক্ষতি। শ্রমিকের ক্ষতির কি আছে? নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। শ্রমিক তো পাগল নয়। কখন পোড়াতে হবে, কখন পোড়ানো ঠিক হবে না সে শিক্ষা তাদের এলাহীর কাছ থেকে নিতে হবে না। জানেন তারা, মালিকের শ্রম-শোষণের ঐ ক্ষেত্র অর্থাৎ কারখানা না পোড়ালে তার দাবি-দাওয়া আদায় হবে না। তাই জ্বালাতেই হবে তাকে– যখন সে প্রয়োজন মনে করবে। শ্রম-শক্তি শোষণ করে যে কারখানা পুষ্ট হয় আবার শ্রমিকেরই ঘাড়ের উপর চেপে বসে – সেটা না পুড়িয়ে কী বা করার আছে শ্রমিকের!

একই দিনের উপসম্পাদকীয় পাতায় দু'টি কলাম ছেপেছে *প্রথম আলো*। এটিই তার চিরাচরিত প্রথা। গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে– যেগুলোতে কর্পোরেট স্বার্থ জড়িত সেগুলোতে বিতর্ক জিইয়ে রাখা, এটাকে সীমাবদ্ধ রাখা বৃত্তের মাঝে। নয়তো বিলোপ করে দেয়া পাঠকের মাথা থেকে।[৫] একজন মানবাধিকার কর্মী হামিদা হোসেন বলছেন, 'অব্যবস্থাপনাই শ্রমিক অসন্তোষের প্রধান কারণ'। অপরদিকে বি.জি.এম.এ'র সাবেক সভাপতি বলছেন, 'কোনো সুবিধাবাদী পক্ষের ইন্ধন রয়েছে'। পাঠক, আমরা আর এগুলোর ভেতরে যাব না। শিরোনাম দেখেই বুঝবেন, এটা নাকি অব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ কিনা শোষণ ঠিক আছে, তবে ব্যবস্থাপনাটা এমন হতে হবে যেন অসন্তোষ না দেখা দেয়। অপর কলামটি নিয়ে আলাপ করার কিছুই নেই। এভাবেই চলেছে। পরের দিনগুলোতেও। পাঠক, আপনি চাইলেই দেখে নিতে পারেন অপরাপর কলামগুলোও। এমন কোনো প্রবন্ধ *প্রথম আলোর* পাতায় আসেনি যেটি শোষণ-সম্পর্কের মর্মমূলে আঘাত করেছে। একেবারে তার স্বরূপ উন্মোচন করেছে। আমার চ্যালেঞ্জ থকল *প্রথম আলোর* প্রতি।

আর *প্রথম আলোর* রিপোর্টগুলো? সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে লেখাটাকে ভারী করার দরকার নেই বোধহয়। কেননা আমাদের জন্য আছে *প্রথম আলোর* সম্পাদকীয়। যেগুলোতে একেবারে পত্রিকার নিজস্ব পলিসির প্রতিফলন ঘটে বলে সাংবাদিকতার বিদ্যাতে আমাদের শেখানো হয়েছে।

২৪মে ০৬ এর সম্পাদকীয় : শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ আচরণ/ এই সহিংস পরিস্থিতি অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক।

এই সম্পাদকীয়তে প্রথম আগের দিনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে যে, '...শ্রমিকদের মনের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বলে আমাদের মনে হয়'। আবার পরের প্যারাতে এসে বলা হলো 'কিন্তু শ্রমিকরা যে কারখানায় হামলা চালিয়ে সম্পদের ক্ষতি করেছেন, তা থেকেই তাদের রুটি-রুজির সংস্থান হয়। শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে শ্রমিককেও ক্ষতির শিকার হতে হয়'।

লক্ষ্য করুন বন্ধু, *প্রথম আলো* শিকার করতে বাধ্য হয়েছে যে শ্রমিকদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে ঐ ঘটনায়। কিন্তু এই ক্ষোভের ন্যায্যতাকে মেনে নিতে পারছেন না তারা। কারখানায় হামলা চালানোটাকে তারা দেখছেন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। বৃথাই বোঝাতে চেষ্টা করছেন আমাদেরকে, যে কারখানায় হামলা চালিয়েছে শ্রমিকেরা সে কারখানাই তাদের রুটিরুজির সংস্থান করে। ঐ মঞ্জুর এলাহীর মতো করেই। একেবারে একই কথা। ঐ যে দেখলাম আমরা এলাহী কারখানাকে বৃক্ষ বলেছেন।

কারখানা রুটি রুজির সংস্থান করে না। রুটি রুজির সংস্থান করে শ্রমিকের শ্রম। ঐ কারখানাও তো শ্রমিকেরই শ্রম। শ্রমিকের মৃত শ্রম পুঁজিতে পরিণত হয়ে কারখানা হয়ে

যায়।[৬] আমরা শিখেছি মার্ক্সের কাছে। কারখানা এলাহীর নয়, মতিউর রহমানের নয়, নয় গার্মেন্টস মালিকের, ঐ কারখানা শ্রমিকের। কিন্তু পুঁজির যুগ ঐ কারখানাকে মালিকের বানিয়েছে। হ্যাঁ পাঠক, এই সেই কারখানা যা শ্রমিকেরই উদ্বৃত্ত শ্রমের ফসল আর তার অধিকার মালিকের। সেই কারখানাই ব্যবহৃত হয় শ্রমিকের শ্রম-শোষণের কাজে। কারখানা যখন বোঝা হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকের কাছে, সেটা যখন তার রুটিরুজির সংস্থান করতে ব্যর্থ হয় তখন শ্রমিক সেটা পোড়াবে – সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? আর কারখানায় আগুন জ্বালালে দাবি আদায় হয়। শ্রমিকরা জানেন সেটা। তাই ভয় দেখিয়ে লাভ নাই তাদের। মতিউর রহমান, গার্মেন্টস মালিক আর মঞ্জুর এলাহীরা যতই ভয় দেখাতে চেষ্টা করুক শ্রমিকদের যে, কারখানা জ্বালাও পোড়াও করলে তাদের ক্ষতি কিন্তু শ্রমিকেরা জানেন, ঐ কারখানা জ্বালালে মালিকেরই ক্ষতি। মালিক ঐ কারখানা দিয়েই শোষণ করতে পারে। পরগাছার মতো বেঁচে থাকতে পারে। শ্রমশক্তি প্রয়োগ না করে বেঁচে থাকতে পারে। তাই জানেন শ্রমিকেরা, যতোক্ষণ শ্রমশক্তি আছে তাদের, ততোক্ষণ দুনিয়ার সমস্ত কারখানা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলেও খুব বেশি ভয় নেই তাদের।

যাক সে কথা। সম্পাদকীয়তে এর পরের বাক্যে এসে বলা হলো 'আবার এটাও কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখালেই তাদের উপর গুলি চালাতে হবে। গুলি না চললে, মৃত্যুর ঘটনা না ঘটলে পরিস্থিতি এতটা অরাজক রূপ নিত না'। পাঠক দেখুন, ঐ অরাজক অবস্থাতেই কিন্তু আপত্তি *প্রথম আলোর*। শ্রমিকের মৃত্যুটা মুখ্য নয় তাদের কাছে। মুখ্য ঐ অরাজকতা। অরাজকতা মানেই কর্পোরেট স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। বিনিয়োগ উৎসাহিত না হওয়া। শ্রম-শোষণের ক্ষেত্র বিলুপ্ত হওয়া। তাই অরাজকতা চান না *প্রথম আলোর* মালিকেরা। পরের লাইনগুলোর সুর ঐ মঞ্জুর এলাহীর সুরের মতোই। শ্রমিকদের বেতন ভাতা বাড়ানো উচিত, মালিকদের আচরণ পরিবর্তন হওয়া উচিত, মানবিক আচরণ করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। আর শ্রমিকদের প্রতি *প্রথম আলোর* পরামর্শ হলো 'শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবিদাওয়া উত্থাপন করা, হঠকারিতার দিকে না যাওয়া। ভাঙচুর আর সহিংসতার পথে না যাওয়াই শ্রেয়। কোনো অবস্থাতেই আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়া উচিত নয়'।

সেই একই কথা। সেই মঞ্জুর এলাহীর বলা কথাগুলোই। কিন্তু পাঠক, আপনি বলুন তো, শান্তিপূর্ণ পথে দাবিদাওয়া উত্থাপনের মানেটা কী? কী তার রূপরেখা? ইতিহাসে এমন কোনো নজির কি দেখাতে পারবেন আপনি যে, মুখে বলে, শান্তিপূর্ণভাবে বলে কোনো দাবি আদায় করা গেছে? দেখাতে পারবেন কি *প্রথম আলোর* ঐ সম্পাদক? শাসক শ্রেণী মানবিক হয়ে কখনও কি দাবিদাওয়া মেনে নেয়? নিলে এতদিনের গার্মেন্টস শিল্পে কেন এমন করে শ্রমিক মারা পড়ে? কেন আগুনে ঝলসে যায় তার শরীর? কেন মাটি চাপা পড়ে তারা? কেন ধর্ষিত হয়? কেন দু'বেলা ভাত জোটে না তাদের? তবে কি তারা দাবি আদায়ের লড়াই করেনি কখনও? সবসময়ই দেখা গেছে সহিংস আন্দোলনই কেবল দাবি আদায়ের সহায়ক হয়েছে। যতই অহিংস আন্দোলনের

তত্ত্ব ঝাড়ুক *প্রথম আলো*; এটাই বাস্তব। এটাই সত্য। আর আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়া উচিত নয় বলছেন যারা তারা কি উত্তর দেবেন যদি একজন শ্রমিক তাকে প্রশ্ন করে যে, কেন আইন মানব? কেন শ্রদ্ধা রাখব তার উপর? আইন তো বন্ধ করতে পারে না তারই মতো কোনো এক শ্রমিকের তৈরি করা দালানের নিচে চাপা পড়া! বন্ধ করতে পারে না তার ঝলসে যাওয়া! বন্ধ করতে পারে না যৌন নিপীড়ন! একটু ভালোভাবে খেয়ে পড়ে বাঁচবার নিশ্চয়তা দিতে পারে না তাদের! কি উত্তর দেবেন আইনওয়ালারা যদি প্রশ্ন করেন একজন শ্রমিক যে, কতজন মালিক কারাভোগ করেছে যৌন নিপীড়নের জন্য যে তারা আইন মানবে? কতজন মালিক আগুনে পুড়িয়ে মেরে কিংবা ভবনের নিচে চাপা ফেলে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ড[৭] ভোগ করেছে যে সে আইন মানবে? কী করেছে আইন যখন প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দেয়া হয় না মজুরির সামান্য টাকাটুকুও? সেই আইন তবে কার জন্য? মালিকের জন্য নয় কী? তবে কেন মানবে শ্রমিক সে আইন? কেন তুলে নেবে না নিজের হাতে?

আইনওয়ালা *প্রথম আলো* তবে আসলে কি চায়? আবারো দেখতে পারি আমরা। চলুন পাঠক, আরেকটি সম্পাদকীয়তে চোখ বুলিয়ে নিই। এবার আরও স্পষ্ট করে বোঝা যাবে বিষয়টি।

২৬ মে-এর সম্পাদকীয়: পোশাক শিল্পের সমস্যা/ফিরে আসুক সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতি

এই সম্পাদকীয়র বক্তব্যও আলাদা কিছু নয়। সারমর্ম করলে যা পাওয়া যায় তা মঞ্জুর এলাহীর বক্তব্য আর *প্রথম আলোর* আগের সম্পাদকীয়টির থেকে আলাদা কিছু নয়। এখানে বরং আরও মনের কথাটা পাওয়া গেছে তাদের। এই যে মতিউর রহমানরা বলছেন, *ফিরে আসুক সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতি*। পাঠক, লক্ষ্য করে দেখুন, ফিরে আসুক শব্দটি। তার মানে কী এই যে, পূর্ববর্তী পরিস্থিতি সুস্থ-স্বাভাবিক ছিল? তার মানে কি প্রতিদিনের নগ্ন শ্রম-শোষণ সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতি? তার মানে কী প্রতিদিনের শারীরিক নিপীড়ন সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতি? তার মানে কি আগুনে পুড়ে মরাটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতি? তার মানে কি বহুতল ভবনের নিচে চাপা পড়াটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতি? হ্যাঁ, পাঠক, এটিই আসল কথা। একেবারে এটাই বড়লোকদের কথা। শ্রম অসন্তোষ না হলে, মসৃণভাবে শোষণ চললে শ্রমিকদের যাই করা হোক না কেন, কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু শ্রম-অসন্তোষ হলে তখন সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতি থাকে না আর। তখন পরিস্থিতি ভিন্ন হয়ে যায়। তখন দাতারাও রেগে যান 'ঠিকমতো'

বেতন-ভাতা না দেবার জন্য। তখন *প্রথম আলো*ও চটে যায় দেশীয় মালিকদের উপর। তখন সুশীল বুদ্ধিজীবীরাও হাহুতোশ করেন। কিন্তু শ্রম-অসন্তোষ না হলে তাদের কোনো কথা নেই। তাহলে সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতিটা কী? কী টের পেলাম আমরা? আমরা টের পেলাম, সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতি হলো শ্রম-অসন্তোষমুক্ত মসৃণ শোষণ-ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার পরিস্থিতি। আপনি কি একমত নন আমার সাথে, প্রিয় বন্ধু?

এই হলো ঘটনা। দেখলেন তো, কিভাবে *প্রথম আলোর* বক্তব্য, 'দাতা'দের বক্তব্য , কলামিস্টের বক্তব্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। শ্রমিক কারখানাতে আন্দোলন করলে সেটাকে শ্রমিক অসন্তোষ হিসেবে দেখা হয়। মালিক বন্ধ রাখলে সেটা মালিক-অসন্তোষ হিসেবে বিবেচিত হয় না কিন্তু! আর এমনি করে রাষ্ট্রও স্থিতাবস্থায় থাকার জমিন পোক্ত করে। রাষ্ট্রের আইনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা তাদের। আইন নিজের হাতে তুলে না নেবার পরামর্শ দিয়েছেন *প্রথম আলো*, দাতা, মালিক, কলামিস্ট সবাই। সে আইনের রূপরেখা কী। আইন হলো সেই দ্রব্য যেখানে শ্রমিক-অসন্তোষ তৈরি হলে কারখানায় কারখানায় পুলিশ, বিডিআর-র‍্যাবে ছেয়ে যায়। কতজন পুলিশ পাহাড়ায় থাকে যখন কারখানায় প্রতিদিন অসংখ্য নারী শ্রমিক ধর্ষিতা হয়? যখন প্রতিদিন পাশবিকভাবে মারা হয়? যখন অনেক শ্রমশোষণের পরেও মজুরিটা পর্যন্ত দেয়া হয় না নিয়মিতভাবে? তবে আইনের কাজ কী? আমরা জানি শোষণ সম্পর্ককে ঠিকঠাক চলতে দেয়া (দেখুন, বাধন অধিকারী:২০০৬)। কার জন্য মিডিয়া? আইন আর মিডিয়া, পুলিশ আর সরকার ততটুকুই মানুষের যতটুকু না হলে তারা ফুঁসে উঠে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। দাতারাও তাই। তাদের কমপ্লায়েন্সের কারণ একটাই। শ্রমিক যেন ফুঁসে না ওঠে। শোষণ-উৎপাদন যেন বন্ধ না হয়ে যায়। বুদ্ধিজীবীও তাই। আর এসব মিলেই রাষ্ট্র। এই প্রান্তিক পুঁজিবাদী[৮] বাংলাদেশ। এই রাষ্ট্র, যে অপরাপর অন্যসব ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠানের মতো করেই জানে যে, অসন্তোষ থেকে নৈরাজ্য হয়। *প্রথম আলোর* মূল শিরোনাম হয় অসন্তোষ থেকে নৈরাজ্য। কিন্তু এই নৈরাজ্য যে আজ বড্ড বেশি দরকার। গার্মেন্টস শ্রমিকেরা তাদের পরিসরে এখনও করে যাচ্ছে ঐ নৈরাজ্য। থেমে থাকেনি গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন। এগিয়েছে আরও অনেক দূর। কথা না রাখবার কাজগুলো চলছে। যদিও ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেবার ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো। আন্দোলনও তবুও চলছে একটু একটু করে। পত্রিকাতে খুব কম জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে সে খবর। তবুও এটাই আশাবাদের জায়গা। এভাবেই আসলে পাল্টায়। এভাবেই পাল্টাবে বলে মনে করি আমি। ইতিহাসও তাই বলে। প্রতিনিয়ত এমন অসন্তোষ না জন্মালে, প্রতিনিয়ত এমন নৈরাজ্য না হলে যে টিকে যাবে এ পঁচা সমাজ-ব্যবস্থা। টিকে থাকবে এ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। নৈরাজ্য মানে আইন না মানা যে আইন বড়লোকের ধন-সম্পদ পাহারা দেয়। নৈরাজ্য মানে রাজা তথা মালিক না মানা যে মালিক শোষণ করে।

নৈরাজ্য মানে মুক্তশ্রমের-মুক্তমানুষদের সামষ্টিক অগ্রগতি। নৈরাজ্য মানে কিন্তু মনেরও নৈরাজ্য। মনের মানে ভেতরের মানুষের স্বাধীনতা। তার মুক্তিমুখীনতা। আসুন বন্ধু, শিখি ঐ শ্রমিকের কাছে। ঐ গার্মেন্টস শ্রমিকের মতো করে আমরাও আমাদের পরিসরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করি। আমার আর আপনার বুকেও কি অনেক অসন্তোষ জমেনি?

শেষের পরে :

আলোচনায় *প্রথম আলো* পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে কীভাবে কর্পোরেট স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে *প্রথম আলো* আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায় মিডিয়া-বুদ্ধিজীবী-আইন-পুলিশ সবকিছু মিলে। বলে রাখা দরকার এটা কিন্তু শুধু *প্রথম আলোর* মামলা না। মামলাটা সমস্ত কর্পোরেট পত্রিকারই। বিজ্ঞাপন, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, বাজার তথা বেচা-বিক্রি সবকিছু মিলে এই চরিত্র রচনা করে। তাদের অবস্থান এমন হতে বাধ্য। বিজনেস গ্রুপগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে চলা তাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে আবশ্যিকভাবে।

আলোচনায় শ্রমিকদের মতো করে যার যার পরিসরে আন্দোলন সংগ্রাম রচনার আবেদন থাকলেও বলা হলো না শ্রমিকদের আন্দোলন তাদের দাবিদাওয়া-জীবনসংগ্রাম-সৃজন-সংস্কৃতির যথার্থ প্রতিফলন মিডিয়াতে কীভাবে পড়তে পারে। প্রথমত মিডিয়াকে বাস্তবতা আর মানুষের মধ্যে একটা সংযোগ হিসেবে পাঠ করতে অভ্যস্ত আমি। বাস্তবতাকে বর্ণনা করা যায় না বলেই আমার বিশ্বাস। এখনও পর্যন্ত। বাস্তবের সাথে মানুষের নিবিড় সংযোগ ঘটানোর কাজটাই মিডিয়ার কাজ হোক – এমনটাই আমার আশা। সেটা কতটা কীভাবে হবে– তার উত্তর নিরন্তর খুঁজে চলেছি অনেকের মতো আমিও। আমার এটাও জানা নেই যে মূলধারার গণমাধ্যমের বিপরীতে শ্রমিকেরা কী করতে পারে। জানা নেই কেননা আমি জানি যে ইংল্যান্ডে শ্রমিকদের প্রেস ছিলো। সেখানকার রিপোর্টিং থেকে কলাম পর্যন্ত লিখত শ্রমিকেরাই। নোম চমস্কির মতো স্বীকৃত বুদ্ধিজীবী চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন সেই পত্রিকাগুলো বাকুনিন-মার্ক্সের মতো করে কথা বলে গেছেন যদিও বাকুনিন-মার্ক্স পড়েননি তারা। এগুলোকে চমস্কি উল্লেখ করেছেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ হিসেবে। (চমস্কি: ২০০২) তো সেই প্রেসগুলো ধ্বংস করা হয় ক্রমাগত বাজারে কাগজের দাম আর ছাপার দাম বাড়িয়ে– একেবারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। এই প্রবন্ধকারের এক ফোটাও বিশ্বাস নেই একই সাথে আপত্তিও আছে যে; শ্রমিকদের জন্য সচেতনতামূলক লেখাগুলো লিখবে মধ্যবিত্তের অগ্রসর অংশ– যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী কিংবা লিটল ম্যাগে কাজ করে। শ্রমিকদের কাজটা– তাদের লড়াইয়ের ভাষাটা তাদেরই নির্মাণ করতে হয় আর তা তারা করেও। বিকল্প মিডিয়া তাদেরকেই গড়তে হবে। আমার এমনই বিশ্বাস। কিন্তু কাজটা খুবই কঠিন। ইতিহাস সাক্ষী, ১৮ শতকের শ্রমিকদের প্রেস সাক্ষী। এমন মিডিয়া শ্রমিকরা কীভাবে গড়তে পারে – মধ্যবিত্ত সচেতন অংশ কেবল সেটা নিয়ে

কাজ করে যেতে পারে। সেই পরামর্শটুকু দিতে পারে শ্রমিকদের। ব্যাস্, এটুকুই যথেষ্ট। বাকি কাজটা ঐ শ্রমিকদেরই।

বলে রাখা খুবই দরকার যে পত্রিকার নাম দেখে যারা কাভারেজ বিচার করে তাদের দলে আমি নেই। *প্রথম আলো* কর্পোরেট পত্রিকা সুতরাং এটি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে– এমন বক্তব্য আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। যথার্থ পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই গার্মেন্টস শ্রমিকদের সাম্প্রতিক আন্দোলনে– কমপ্লায়েন্স-এর জায়গাটাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একলাফে সমুদ্র পার হবার নীতিতে আমি বিশ্বাসী না যতক্ষণ শ্রমিকরা সেই সক্ষমতা অর্জন না করেছে। কমপ্লায়েন্সই যখন মানা হচ্ছে না তখন কারখানা দখল করে নিয়ে বিপ্লব করবার অলীক চিন্তাটা আমার এখনই নেই কেননা শ্রমিক নিজেই বলছে ২ বেলা খাবার জোটানোর কথা। সেই কাজটাই আগে সম্পন্ন করা দরকার বলে আমি মনে করি। শ্রমিকরা এরপর অবশ্যই অনুভব করবে– ক্রমাগত শোষণের প্রক্রিয়াটা স্পষ্ট হবে তাদের কাছে। তখন কারখানা দখল কিংবা বিপ্লবের কাজটা হবে অনেক বেশি সংগঠিত। এই কমপ্লায়েন্স মানার ক্ষেত্রে– তথা এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে *প্রথম আলোর* অবস্থান কিন্তু মোটেও শ্রমিকদে বিপক্ষে নয়– চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। যদিও পক্ষে অবস্থান নিয়েছে পত্রিকাটি সেটি বলাও বাতুলতা। কিন্তু শ্রমিকদের বেতন-ভাতার দাবি পূরণ হলে *প্রথম আলোর* স্বার্থের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না বলেই তারা শ্রমিকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি। কাভারেজগুলো তারই প্রমাণ। কর্পোরেট স্বার্থ *প্রথম আলোর* স্বার্থ আর শ্রমিকদের স্বার্থের মধ্যে তারতম্য ঘটে না ঠিক মতো বেতন দিলে। প্রবন্ধে বলেছিও বারবার এই কথাটি। এক্ষেত্রে *প্রথম আলোর* অবস্থান মধ্যস্থতাকারীর মতো। দাতাদের, শ্রমিকদরদী মধ্যবিত্ত পাঠকের, সুযোগ পেলে দেশীয় মালিকদের সবাইকেই খুশি রাখতে চেয়েছে তারা। মোট কথা রাষ্ট্রের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছে।

রেফারেন্স ও টীকাটিপ্পনী :

১.কর্পোরেট মিডিয়ার কড়া দৃষ্টি এড়িয়ে অনেক সময়ই এমন তথ্য পত্রিকার পাতায় উঠে আসে যা কর্পোরেটের স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ নয়। চলে যায় একেবারে কর্পোরেট স্বার্থের বিপরীতে। হয়তো কখনও সংবাদকর্মীর ভেতরে সুপ্ত থাকা আদর্শ সে প্রতিফলিত করতে চায় পত্রিকার পাতায়। সহ-সম্পাদকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় সে বিষয়টি, অথবা মনের অজান্তেই এমন কিছু ছেপে দেন যা বৈরী পরিবেশ তৈরি করে। এমনও হতে পারে সময় কম থাকবার কারণে এমন লেখা ছাপাতে হলো যেটা কর্পোরেট আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

২.মার্শাল ম্যাকলুহান প্রথম বলেছিলেন সংবাদপত্রগুলো কীভাবে অখণ্ড জগতকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করে। অখণ্ড পৃথিবীর সাপেক্ষিক ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা কলামে আলাদা আলাদা শিরোনামে তুলে ধরে দৈনিক পত্রিকাগুলো। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, 'প্রযুক্তি একুশ শতক একুশ শতকের মানুষের গল্প'– আমার এই প্রবন্ধটি। লেখাটি পাবেন গণযোগাযোগ বিভাগের শিক্ষার্থীদের পত্রিকা *উন্মেষ*-এর দ্বিতীয় সংখ্যায়।

৩.আসলে দাতা শব্দটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক শব্দ। আমাদের মূলধারার অর্থনীতির আলোচনায় শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শাব্দিক অর্থের সাথে এর ব্যবহারিক অর্থের মিল নেই কোনো। দাতা হলো তারা যারা উচ্চ সুদে ঋণ দেয়। দেখুন আনু মুহম্মদের 'দাতারা কী দেয়', *বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

৪.গণমাধ্যমগুলো পাঠকের কাছে পত্রিকা বিক্রি করে আর পাঠককে বিক্রি করে দেয় বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে। চমৎকার এই বিষয়টি আমাদের প্রথম টের পাইয়ে দিলেন নোম চমস্কি। দেখা গেলো যে অডিয়েন্স *প্রথম আলো* কেনে সে গ্রামীণ ফোনের কাছে বিক্রি হয়ে যায় খুবই চমৎকার পদ্ধতিতে। এমনি করে আরও অনেক অনেক বিজ্ঞাপনদাতার কাছে আমি আমার স্বকীয়তা বিক্রি করি। যখন সে আমাকে কে ক্রাফটের পোশাকের কথা বলে; আমি পোশাক পরবার ব্যাপারে আমার নিজস্ব সিদ্ধান্তের জায়গাটাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি কে ক্র্যাফট পর্যন্ত। দেখুন চমস্কির চমৎকার প্রবন্ধ : মিডিয়া এ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন, পাবেন chomsky.info তে।

৫.কর্পোরেট মিডিয়াগুলো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিতর্ক জিইয়ে রাখে বলে প্রথম মত দিলেন ফাহমিদুল হক। দেখুন তার নিস্ফল আকুতি 'বাংলাদেশের সংবাদপত্রের বাজারমুখীনতা : ভিন্ন ভাবনার প্রস্তাবনা'। এই মতামতকে নাকচ করলেন আরেকজন নিরাশাবাদী মানস চৌধুরী তাঁর 'ঘোরাটোপে পড়া সম্ভাবনাময় বিতর্ক' নামক একটি সমালোচনায়। তিনি বলতে চাইলেন মূলধারার মিডিয়াগুলো বিতর্ককে বিলীন করে দিতে পারঙ্গম। আর আমি এই দুজনের কাছে শিখলাম স্থির একটি অবস্থান কত্তো ক্ষতিকর। পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয়গুলোতে একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখা গেলো দু'টি কাজই করে মূলধারার গণমাধ্যমগুলো যখন যেটার দরকার পড়ে। বিতর্ক জিইয়ে রেখে তারা দেখাতে চায় আমার অবস্থান নিরপেক্ষ। এই যেমন টাটার বিনিয়োগ নিয়ে *প্রথম আলোর* কাভারেজগুলি। টাটার বিনিয়োগের বিষয় সম্পর্কিত বিতর্ককে কিন্তু জিইয়ে রেখেছিল তারা। সুযোগমতো অবশ্য বিলীন করে দিয়েছে। তবে বলে রাখা খুবই দরকারি যে একেবারে ছক মেপে, ফন্দি এঁটে তারা এমন কাজ করে এমনটা কিন্তু নয়। বিতর্ক বিলীন করে দেয়াটা অনেকাংশে নির্ভর করে পত্রিকায় জায়গা দেয়া-না দেয়ার উপর। আর বিতর্ক জিইয়ে রাখবার বিষয়টি নির্ভর করে ইস্যুটি কর্পোরেট স্বার্থের সাথে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ কিংবা তার নিজস্ব স্বার্থের সাথে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ তার উপর।

৬.পুঁজি আসলে যে শ্রমিকের মৃত শ্রম সেটা প্রথম আমাদের শিখিয়েছেন কার্ল মার্কস। চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন তিনি শ্রমিকের যে উদ্বৃত্ত শ্রম মালিক শোষণ করে সেটা পুঁজিতে পরিণত হয়। সেটাকেই মার্কস নাম দিয়েছেন মৃতশ্রম। কারখানাও একইভাবে গঠিত আর স্ফীত হয় ঐ মৃতশ্রমেই।

৭.বিচারপদ্ধতি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড আমি কোনোভাবেই সমর্থন করি না। এমনকি বিচার ব্যাপারটাকেই পারতপক্ষে অগ্রাহ্য করতে চাই আমি।

৮.পুঁজিবাদের বিকশিত যুগে এসে পুঁজিবাদী দেশগুলো দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি পুঁজিবাদের কেন্দ্র আর অপরটি পুঁজিবাদের প্রান্ত। কেন্দ্রকে নাম দেয়া হয়েছে কেন্দ্রস্থ-পুঁজিবাদী দেশ আর প্রান্তকে নাম দেয়া হয়েছে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী দেশ। কেন্দ্র তার পুঁজি নিয়ে বিনিয়োগ করবার জন্য যে দেশগুলোতে দৌড়ে বেড়ায় কিংবা বেড়াতে পারে সস্তা শ্রম শোষণের নিমিত্তে সেগুলোই প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী দেশ।

স্থানীয় সংবাদপত্রের পাঠক: স্বপ্ন-সম্ভাব্যতার নিরিখে

স্থানীয় সংবাদপত্রের কথা ভাবতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে চারপৃষ্ঠার এক বিবর্ণ পত্রিকার অবয়ব। দূর্বল পৃষ্ঠাসজ্জা আর অগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু দিয়ে ভরা মলিন এক কাগজের প্রতিমূর্তি। চুল কাটবার সেলুন, মুদি দোকান, একবারে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার– যাদের ৭/৮ টাকায় জাতীয় দৈনিক কিনে পড়বার সামর্থ্য সেই কিন্তু তথ্যের চাহিদা রয়েছে সেই তারা, আর রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনগুলোর বাইরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে যার পাঠক পাওয়া যায় কমই। যদিও জাতীয় দৈনিকের ব্যুরো অফিসগুলোও সংগত কারণেই স্থানীয় পত্রিকার ভোক্তা। স্থানীয় পত্রিকার পাঠক কারা সেটাকে তাই আমি আমার আলোচ্য করছি না, বরং স্থানীয় পত্রিকার পাঠক কারা হয়ে উঠতে পারে এবং স্থানীয় পত্রিকা তার হয়ে ওঠা সেইসব পাঠকের জন্য কী তাৎপর্য তৈরি করতে পারে সেটাকেই আমি খুব ছোট্ট পরিসরে আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করছি।

স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে ইস্যু হিসেবে প্রাধান্য দেয় রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন সভা-সেমিনারের খবর, হত্যাকাণ্ড-মারামারি-কোন্দল, ধর্ষণ-নারী নির্যাতনের রসাত্মক গল্প, স্থানীয় ক্ষমতাশালী রাজনৈতিকের ভাষ্য ইত্যাদিকে। কোনো জাতীয় ইস্যু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে সেটাকেও তারা ইস্যু হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। স্থানীয় সমস্যার বিবরণগুলোও থাকে, তবে যতোটা থাকা উচিত ততোটা নয়। আর সেজন্যই স্থানীয় সংবাদপত্র উপরের প্যারায় নির্দিষ্ট করা পাঠকগোষ্ঠীর চৌহদ্দী পেরিয়ে স্থানীয় জনগণের পত্রিকা হয়ে উঠতে সক্ষম হয় না। কিন্তু আমার বিবেচনায় স্থানীয় পত্রিকার ভূমিকা কোথাও কোথাও জাতীয় পত্রিকার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এবং জাতীয় পত্রিকার থেকে স্থানীয় পত্রিকার পক্ষে জনগণের পত্রিকা হয়ে উঠবার সুযোগ বেশি।

এখানে প্রধানতম বিবেচ্য হলো মালিকানার প্রশ্ন এবং স্থানীয় পত্রিকার বিজ্ঞাপন-প্রাপ্তির প্রশ্ন। স্থানীয় পত্রিকার মালিকানা সাধারণত কর্পোরেট মালিকানা হয় না। হয় না বলেই কর্পোরেট পুঁজির অনুকূল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ নির্মাণের দায় দায়িত্ব তার কাঁধে থাকে না; যেমনটা থাকে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর বেলায়। বাংলাদেশের প্রধানতম জাতীয় দৈনিকগুলোর সবগুলোই কোনো না কোনো কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন। তাই কর্পোরেট পুঁজির অনুকূলে জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী ভূমিকা তাদের নিতে হয়। দেশের তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর-সহ যাবতীয় জাতীয় সম্পদ রক্ষার প্রশ্ন তাই জাতীয় পত্রিকার বিবেচ্য হয় না। বিবেচ্য হয় না দেশীয় পুঁজির বিকাশের আরও নির্দিষ্ট করে বললে স্থানিক উদ্যোগগুলোর প্রশ্ন। নিও লিবারাল বিশ্বায়িত বাজারের সপক্ষে প্রচারণা-পরিবেশনা জারি রেখে জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে আইনের শাসন-কর্পোরেট(গণ)তন্ত্র-এলিট স্বার্থমুখী প্রচারণার মিলিত ঐকতান জাতীয় দৈনিকের উপজীব্য। সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে নিত্য প্রচারণা জারি রাখা কিন্তু সেইসবের উৎসমূলের খোঁজ না করা, নিও লিবারাল বাজারের বিস্তৃতির সাথে

তাকে মিলিয়ে পাঠ না করা, একটি ভোগবাদী এলিটিস্ট খাদক সমাজের গতিমুখ নির্মাণ করাই জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রধানতম কর্তব্য। এরই বিপরীতে স্থানীয় পত্রিকাগুলো দাঁড়াতে পারে দেশীয় পুঁজি ও দেশীয় সম্পদ রক্ষার প্রশ্ন নিয়ে। বহুজাতিক আগ্রাসী বাজারের বিপরীতে দেশের দরিদ্র মানুষের পক্ষ নিয়ে। তাদের ক্ষুধা-দারিদ্র্য-হতাশা-ক্ষোভকে সমাজ-ইতিহাসের নির্দিষ্ট এই কালপর্বের সাথে যতোটা পারা যায় সম্পৃক্ত করে বুঝে নিয়ে সেই মোতাবেক পদক্ষেপ নিতে। কেননা তাকে কর্পোরেট স্বার্থের অঙ্গীভূত থাকতে হয় না।

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও স্থানীয় পত্রিকাগুলো বহুজাতিক-কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল না। তাদের বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির প্রধানতম উৎস স্থানীয় উদ্যোগগুলোই। তাই অনায়াসেই তারা ইচ্ছে করলে সেলফোন কোম্পানিগুলোর অন্যায্যতার বিরুদ্ধে রিপোর্ট-অনুসন্ধান-প্রতিবেদন-নিবন্ধ ছাপিয়ে যেতে পারে যেটা সম্ভব হয় না *প্রথম আলো ডেইলি স্টারের* মতো পত্রিকার বেলাতে। গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করতে পারে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতার প্রশ্নকে। কেননা জাতীয় দৈনিকগুলোর বিজ্ঞাপনের একটা বড় অংশ সরবরাহ করে ফোন কোম্পানিগুলো যেখানে স্থানীয় পত্রিকার বিজ্ঞাপন আসে স্থানিক উদ্যোগগুলো থেকে। এমন উদাহরণ আরও বাড়িয়ে তোলা সম্ভব যেখানে দেখা যাবে জাতীয় পত্রিকার সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু স্থানীয় পত্রিকা পরোয়া না করলেও পারে।

জাতীয় পত্রিকার পক্ষে লোকাল ইস্যুকে প্রাধান্য দেবার সুযোগ কম থাকে সঙ্গত কারণেই। বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনের আর শহুরে এলিট শ্রেণীর খবরের ভীড়ের মাঝে লোকালয় কিংবা আলোকিত উত্তর কিংবা বিশাল বাংলা এমন নাম দিয়ে ভেতরের দিকের পৃষ্ঠার ট্রিটমেন্ট হয় স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো। কিংবা হয় না। স্থানীয় পত্রিকা এক্ষেত্রে সত্যিকারের জন-গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে জনমুখী ভূমিকা নিতে পারে।

স্থানীয় পত্রিকাগুলো উন্নয়ন-ক্ষমতায়ন-অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে সত্যিকারের সাংবাদিকতার সূচনা করতে পারে। যেহেতু তাদের কাজের পরিসর ছোট; সেজন্য ইচ্ছে করলে সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে স্থানীয় পত্রিকা সত্যিকার অর্থেই হয়ে উঠতে পারে সমাজের দর্পণ। এক্ষেত্রে সরকারের নেতিবাচক পরিকল্পনা, যা জনগণের বিপক্ষে যায়, এবং স্থানিকতাকে প্রভাবিত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জারি রাখতে পারে স্থানীয় সংবাদপত্র। বিপরীতে সরকার-ঘোষিত বিভিন্ন ইতিবাচক নীতি-পরিকল্পনা যা অর্জিত হয়েছে জনপ্রতিরোধেরই কারণে; সেগুলোর বাস্ত বায়নে ওয়াচডগ ভূমিকা পালন করার কাজটি করতে পারে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো। এই যেমন সরকারের কৃষি ঋণ, বীজ ব্যবস্থাপনা ও সারের বণ্টনের প্রশ্নটি। বর্তমান সরকার বিশাল পরিমাণের কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করেছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন, এবার শহর থেকে গ্রামে টাকা যাবে। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দের কারণে সরকারের প্রদত্ত ঋণ-সুবিধা যথাযথভাবে কৃষকের কাছে পৌঁছায় না। অতীত অভিজ্ঞতা এমনই। স্থানীয় পত্রিকাগুলো এক্ষেত্রে ওয়াচডগ ভূমিকা নিয়ে পর্যবেক্ষণ জারি রাখতে পারে এবং কৃষকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। এমনি করে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নারীর উপর নির্যাতন-ফতোয়া, সংখ্যালঘু নির্যাতন, রাজনৈতিক ক্ষমতার শিকার হওয়া মানুষ, প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা, স্থানীয়-সরকারের অন্যায়-অবিচার, বেসরকারী সন্ত্রাস-দুর্নীতি-চাঁদাবাজি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে জনমুখী ভূমিকা নিতে পারে।

বিশেষভাবে বলছি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ের কথা। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ও শিক্ষার বিস্তারে স্থানীয় পত্রিকা নিতে পারে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে স্থানীয় পত্রিকার পক্ষে জোড়ালো ভূমিকা রাখা সম্ভব। সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত ডাক্তার ও ঔষধের অভাব, ডাক্তার-নার্সদের নিয়মহীনতা-দুর্নীতিপ্রবণতা, ক্লিনিক বাণিজ্যের বিপরীতে রিপোর্ট প্রকাশ করে জনগণের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায়। বাজার-অর্থনীতির এই যুগপর্বে এসে শিক্ষা যখন মৌলিক মানবাধিকার থেকে পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তখন সরকারের গৃহীত শিক্ষা-উদ্যোগগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সেটা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখার দায়িত্ব পালন করে স্থানীয় পত্রিকাগুলো শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো পড়ালেখা না হওয়া, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা মেরে খাওয়া, সরকারী শিক্ষালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষকের এবং শিক্ষা-উপকরণের অভাব থাকার ঘটনাগুলো জোড়ালোভাবে উঠে আনতে পারলে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। শিক্ষার প্রসার মানে কিন্তু পত্রিকার পাঠকেরও প্রসার– এই কথা স্থানীয় পত্রিকাগুলোকে মনে রাখতে হবে। আর এভাবেই গণতন্ত্রকে যথার্থ অর্থে গণতন্ত্রে রূপায়িত করবার পক্ষে পত্রিকার নিজের দায়িত্বটি সম্পাদন করা সম্ভব। গণতন্ত্রের নামে জারি থাকা ৩০০ জন তথাকথিত জনপ্রতিনিধির সংসদীয় একনায়কতন্ত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে স্থানীয় সংবাদপত্র তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। হয়ে উঠতে পারে স্থানীয় সংসদ। জনতার সংসদ। জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের একটি মাধ্যম।

কিন্তু সে পথেও বাধা আছে। স্থানীয় পত্রিকাগুলোর মালিকানা, সেখানে বিরাজমান রাজনৈতিক-প্রশাসনিক চাপ, অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে সাংবাদিকদের ভালো বেতন দিতে না পারা– সবমিলিয়ে তার বেহাল দশা। দেখা যায়, স্থানীয় পত্রিকার অনেক সাংবাদিকই দুর্নীতিগ্রস্থ। কারণ তারা ভালো বেতন পান না। লাইনেজ পান না। খুব কম টাকায় বিক্রি হয়ে যান ক্ষমতাশালীদের কাছে। তাই স্থানীয় পত্রিকার হয়ে উঠবার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভালো বেতনের নিশ্চয়তা বিধান করবার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তিতে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাকে বাড়িয়ে তোলা, গণমাধ্যমের নৈতিকতা-জবাবদিহিতার

ব্যাপারে তাদের মধ্যে সচেতনতামূলক সভা-সেমিনারের আয়োজন করবার দায়িত্বটি সমাজের সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরই বর্তায়। সেই দায়িত্বটি অস্বীকার করে স্থানীয় পত্রিকার কাছে, স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছে বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে তখনই যখন ভালো সার্কুলেশন থাকবে। ভালো সার্কুলেশন মানেই হলো বেশি বেশি পাঠক তৈরি হওয়া। আর দরকার স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বেশি বেশি বিজ্ঞাপন। অনেক স্থানীয় দৈনিকই পত্রিকা করবার নামে নিউজপ্রিন্টের ব্যবসা করে বলে অভিযোগ জারি আছে। অভিযোগটা মিথ্যে না। মিথ্যে সার্কুলেশন দেখিয়ে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক দামে নিউজপ্রিন্ট কিনে সেটাকে বিক্রি করে দেবার ঘটনা অহরহ ঘটে যায়। এ অবস্থার পরিবর্তন এনে যদি স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে পত্রিকাগুলো এবং বড় ধরনের পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করতে পারে তাহলে বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির হার সঙ্গত কারণেই বেড়ে যাবে। আর পাঠক গোষ্ঠীকে প্রসারিত করবার জন্য চাই পত্রিকার সত্যিকার অর্থে পাঠকের পত্রিকা হয়ে ওঠা। পাঠকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চাহিদা যদি স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো সরবরাহ করতে পারে তখন অবশ্যই পাঠক বাড়বে। তারা কিনে পত্রিকা পড়বে। একদিকে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিজ্ঞাপন অন্যদিকে স্থানীয় পাঠকের কাছে বিক্রির পরিসর বড় হওয়া– সবমিলিয়ে পত্রিকার দাঁড়িয়ে যাবারও সুযোগ তৈরি হবে। তখন সাংবাদিকদের ভালো বেতনও দেয়া যাবে। তাদের দুর্নীতিগ্রস্ততা কমবে। স্থানীয় পত্রিকাগুলো যদি বিবেচনায় নেয়, বিজ্ঞাপনদাতা কিংবা ঘুষদাতা নয়; পাঠকই পত্রিকার প্রাণভোমরা তাহলে অনেক জনমুখী পরিবর্তন সম্ভব। পাঠকই পত্রিকার শক্তি, পাঠকই তার প্রেরণা, পাঠকই তার উপজীব্য, পাঠকই তার উৎস– এই ধারণা যতো বেশি দৃঢ় হবে স্থানীয় পত্রিকাও ততো শক্তিশালী হবে।

বাধা-বিপত্তি আছে। কিন্তু সেটাকে অতিক্রম করে স্থানীয় পত্রিকার সুযোগ আছে সত্যিকারের স্থানিক-দর্পণ হয়ে উঠবার। যে দর্পণে শুধু সুবিধাভোগী এলিট শ্রেণীর চেহারা-ছবি ভেসে উঠবে না। দেখা যাবে সমগ্র জনতাকে।

মুক্তপ্রকাশ; ২০০৯

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয়তার প্রশ্নের বিবেচনায় টিফা-ট্রানজিট-টাস্কফোর্স নিয়ে আলাপচারিতা

১১ই জানুয়ারির সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর বাংলাদেশে নিও লিবারালিজমের দর্শন আরও ব্যাপকভাবে প্রচার করা শুরু হয় এবং সেই সময় নতুন সেই যুগপর্বকে আমি মার্কেট মিডিয়া মিলিটারি যুগপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করি।[১] নির্বাচনের পর মহাজোট সরকার গঠন করলে সেই তিন ম এর মিলিত আধিপত্যের যুগপর্বে নতুন আলোচনা নিয়ে হাজির হয় টিফা-ট্রানজিট-টাস্কফোর্স চুক্তির বিষয়গুলি। এই তিন এম আর তিন টি মিলে এমটি– মজা করে বলছি এম্পটি অর্থাৎ একটি শূন্য বাংলাদেশ বানানোর প্রকল্প চলছে। সেই প্রকল্প নিয়েই আমার আলোচনা।

টিফা-ট্রানজিট-টাস্কফোর্স নিয়ে আমাদের এই জনপদে যে একেবারেই আলোচনা হয়নি তা নয়। আলোচনা হয়েছে চুক্তির ভালো-খারাপ দিক নিয়ে। জনগণের কাছে তথ্য গোপন করে চুক্তি করা ঠিক কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে একটু-আধটু। তবে সেটা পর্যাপ্ত নয়। আমাদের এই আলোচনায় আমরা জাতীয় দৈনিক *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত উপসম্পাদক আনিসুল হকের একটি প্রবন্ধ ধরে আলোচনা তুলব। সেই আলোচনার সূত্র ধরে আমরা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তন, বুদ্ধিবৃত্তি, মিডিয়া এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কসূত্রকে পাঠ করবো টিফা ট্রানজিট টাস্কফোর্স চুক্তির উছিলায়। ২য় পর্যায়ে খুবই সংক্ষেপে আমরা টিফা-ট্রানজিট-টাস্কফোর্সের উপর একটি পর্যালোচনা দাঁড় করাবো।

আনিসুল হক, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত নিবন্ধে এক বন্ধুর দোহাই দিয়ে বলছেন,

> "বন্ধু বললেন, 'দেশের জন্য কোনটা লাভ আমরা বুঝব কী করে?' আমি বললাম, 'এটা তো আমি বুঝব না বা তুমি বুঝবা না, বুঝবেন ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। আবার একজন বিশেষজ্ঞকে হুট করে বললেই হবে না। তাদের বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে হবে, অনেকে মিলে বসে দিনের পর দিন গবেষণা করে, বিশ্লেষণ করে তারা বলবেন, এই ধরনের একটা সিদ্ধান্তে এই এই লাভ, এই এই ক্ষতি, তারপর তারা উপসংহারে আসবেন, লাভের ভাগটাই বেশি অথবা ক্ষতির। তখন আমাদের নীতিনির্ধারকেরা সিদ্ধান্ত নেবেন, দেশের জন্য লাভজনক হলে তারা হ্যাঁ বলবেন, না হলে তারা না বলবেন।' "

কথাটা যে আনিসুল হকের এমন মনে করাটা ভুল হবে। আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শাস্ত্র, আমাদের মিডিয়া অধ্যয়নের শাস্ত্র সর্বোপরি তাবৎ বিদ্যায়তনিক শাস্ত্র এবং কর্তৃত্বপরায়ণ মানস থেকে উত্থিত এই মতামত। আনিসুল হক সেই জারি থাকা দীক্ষায়ন প্রকৌশলের একজন ক্রীড়ানক মাত্র। আমাদের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান যাদের নাম দেয় বুদ্ধিজীবী। হাজার বছর ধরে জারি থাকা কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজ কাঠামোতে বিশ শতকে বিকশিত হয় সম্মতি উৎপাদনের সমাজবিজ্ঞান। নোম চমস্কি জানান

দিয়েছেন, প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কী বিপুলভাবে রাষ্ট্রীয় প্রচারণা জারি রাখতে বৃটিশ তথ্য মন্ত্রণালয়, ক্রিল কমিশন, জনসংযোগ ইন্ডাস্ট্রি আর বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার করা হয়েছে। আর ঐ বিশ শতকেই বিকশিত হয় বিদ্যায়তনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর প্রোপাগান্ডা-কৌশল। হ্যারল্ড ডি ল্যাসওয়েল-সহ অন্যান্যরা মিলে প্রতিষ্ঠা করেন এ মতবাদ যে, জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন ভ্রান্ত যুক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। ওয়াল্টার লিপম্যান, ১৯২০ সালের দিকে গণতন্ত্র নিয়ে প্রচুর লেখাপত্র করেছেন। প্রোপাগান্ডা এজেন্সির কর্মকাণ্ড থেকে ব্যবহারিক শিক্ষা নিয়ে তিনি গণতন্ত্রের নতুন ধারণা আনেন সম্মতি উৎপাদন নামে। আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের যেখানে ভোট দেবার সুযোগ আছে সেখানে ঐ সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করতে গেলে তার সম্মতি উৎপাদন করতে পারলেই হলো– লিপম্যান এমনটাই মতামত দেন।[২] এইসব মিলেই দাঁড়িয়ে যায় দীক্ষায়ন প্রকৌশল, সম্মতি উৎপাদন করা যার কাজ।

আর এভাবে জারি থাকা দীক্ষায়ন প্রকৌশল আমাদের দীক্ষায়িত করে এই মতবাদে যে, জনগণের পক্ষে কোনোভাবেই তাদের নিজেদেরকে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। জনগণ স্বভাবতই সেটাই ভাবতে থাকে। কীভাবে তারা পরিচালিত হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে মাত্র ক'জন মানুষ। সেই মানুষগুলো কারা? সেই মানুষগুলো হলো রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন সরকার বা আনিসুল হক কথিত নীতি নির্ধারক, বুদ্ধিজীবী কিংবা আনিসুল হক কথিত স্পেশালিস্ট এবং সেই বুদ্ধিজীবীদের স্পেস দেওয়া মিডিয়া কিংবা *প্রথম আলো* এবং বিদ্যায়তনিক শাস্ত্র কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান/গণযোগাযোগ ইত্যাদি। মিডিয়া তার বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে সম্মতি উৎপাদন করবে। আর সেই সম্মতি না উৎপাদিত হলে, জনগণ সম্মতি না দিলে বলপ্রয়োগের জন্য আছে সেনাবাহিনী-সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনী। এভাবেই জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে থাকে। সমাজে জারি থাকে কর্তৃত্বের কাঠামো। আধুনিকতার এই ঐতিহাসিক যুগপর্বে এই কর্তৃত্বের নাম বাজার-অর্থনীতি। মুক্তবাজারের কিংবা অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের নামে জারি রাখা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাশালী কয়েকটি রাষ্ট্র, তাদের নির্দেশ মেনে চলা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পূর্ণ কর্তৃত্ব। যাকে আমরা অনায়াসেই ডাকতে পারি অর্থনৈতিক স্বৈরতন্ত্র নামে। জনগণের চোখ মূল সমস্যা থেকে, একেবারে তাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে তার চোখ নিয়ে যাওয়া হয় ক্রিকেট-ফুটবল-আইসিএল-আইপিএল-ইউরো-বিশ্বকাপে কিংবা বিনোদনের ভার্চুয়াল জগতে। তাই কর্তৃত্বশীল কেন্দ্রস্থ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও তাদের নিজেদের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, মানে বাংলাদেশের মতো প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে টিফা-ট্রানজিট-টাস্কফোর্স নাম নিয়ে যে চুক্তিগুলো একেবারে জনগণের নামে করা হয় সেগুলো সম্পর্কে জনগণ জানতেই পারে না। কী আশ্চর্য এই সমাজ ব্যবস্থা। আমার নামে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাচ্ছে অথচ আমি মতামত দেওয়া তো দূরের কথা, জানতেও পারছি না সেটা! তাই বাণিজ্য

চুক্তি নিয়ে আলাপের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটা কেন্দ্রীয় বিবেচনায় থাকা দরকার সেটা হলো আমার নামে চুক্তি হবে, অথচ আমি সেটা জানতে পারব না কেন? ভালো-মন্দ তো পরের বিবেচনা। কিন্তু এই প্রশ্নটা উত্থিত হয় না। উত্থিত হয় না, কেননা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান আর সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর পালিত বুদ্ধিজীবীরা ক্ষমতাকেন্দ্রের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বশীল কাঠামোতে তারাও সুবিধার ভাগীদার। আর সম্মতি উৎপাদন তো আছেই। যে *প্রথম আলো* আনিসুল হককে উপসম্পাদকের চাকরিতে বহাল রেখে প্রচুর টাকা বেতন দেয় সেই *প্রথম আলো* তো একটি বহুজাতিক কর্পোরেশনেরই পত্রিকা। আর তার যে কর্তৃত্বপরায়ণ মানস সেটা তো কর্তৃত্বশীল বিদ্যায়তন ও তার অগ্রজ বুদ্ধিজীবীদেরই উত্তরাধিকার। সুতরাং বহুজাতিক স্বার্থ রক্ষা করা তার কর্তব্য। যে সম্মতি তার মননে উৎপদিত হয়েছে সেটা হয়তো তিনি টেরও পান না। জারি থাকা কর্তৃত্বশীল সমাজকাঠামোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। বহুজাতিক স্বার্থ কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা কয়েকজন মানুষের স্বার্থ জারি রাখবার প্রধানতম কৌশল হলো জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে মুষ্টিমেয়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। আর তাই রাষ্ট্র ও বহুজাতিক স্বার্থ মানে বাজার-অর্থনীতির স্বার্থ; আর জনগণের স্বার্থের ফারাকই নির্ধারণ করে যে, আনিসুল হক এমনই বলবেন।

কিন্তু আমরা যারা সেইসব ক্ষমতাবৃত্তের কাছে এখনও আত্মসমর্পন করিনি (আমাদের ২/৩ জন অর্থনীতিবিদও আছেন যারা প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছেন তাদের মতো করে, বলতে চেষ্টা করছেন, তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি) তাদের দায় থেকে যায়। তাদের প্রথম দায়টা হলো এই কথা বলা যে, জনগণকে না জানিয়ে কোনো চুক্তি করা যাবে না এমনকি ভালো চুক্তি হলেও করা যাবে না। কেননা মিথ্যে নয় এই প্রবাদ যে, 'নিজের ভালো পাগলেও বোঝে'। আমার ভালো আমার থেকে কেউ বেশি বুঝতে পারে না। তাই জনগণের নামে যখন চুক্তি হয় তখন দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিজস্ব বিবেচনাবোধ থেকে তারাই সবথেকে ভালো বুঝবেন এটা তাদের জন্য ভালো না খারাপ। ২য় দায়টা হলো, অগ্রসর হবার কারণে এবং মিডিয়া-বিদ্যায়তনের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকবার কারণে আমাদের কাছে একটু আধটু তথ্য এই চুক্তিগুলো নিয়ে থাকে। তা নিয়ে যতোটুকু পারা যায় আলাপ তোলা। আমরা এবার সেই আলাপ তুলছি।

টিফা

২০০৫ সালের ৩০ জানুয়ারি যে টিফা ড্রাফট প্রকাশ হয়েছিল তার সাথে নতুন কোনো ধারা বা আর্টিকেল যুক্ত বা বিযুক্ত হয়েছে কিনা তা এখনও পর্যন্ত আমরা জানি না। তারপরও এই খসড়াটি আমাদেরকে চুক্তিটি সম্পর্কে বোঝাপড়া করতে অনেকখানি সাহায্য করে। তাই ২০০৫ এর টিফা ড্রাফট্টির পরিপ্রেক্ষিতেই চুক্তি নিয়ে আমাদের এই বিশ্লেষণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিটি করার উদ্দেশ্য মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাঝে মার্চ ১২, ১৯৮৬ সালের স্বাক্ষরকৃত চুক্তির (বায়োল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট এগ্রিমেন্ট) আরও বিকশিত রূপ প্রতিষ্ঠা করা। চুক্তির ১০ এবং ১১ নম্বর ধারা এই বিষয়কেই প্রশ্নাতীত করে। ১১ নং ধারা বায়োল্যাটারাল ইন্টভেস্টমেন্ট ট্রিটি চুক্তিটির স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু টিফার ১০ নম্বর ধারাতে আছে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বিষয়ক সমস্যাগুলোর যতো দ্রুত সম্ভব সমাধানের আকাঙ্ক্ষা এবং এই ধারার মধ্যেই আমেরিকার অবাধ বাজার প্রতিষ্ঠার সুযোগ আরও বিকশিত হয়। চুক্তির অন্যান্য ধারাগুলোও বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারকে আরও নিরঙ্কুশ আরও অবাধ করবার উদ্দেশ্যের সাথে বেশ মানিয়ে যায়। যেমন চুক্তির ৫, ৯, ১৩ এবং ১৪ নম্বর ধারাকে মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং বেসরকারি খাতের কন্ট্রাক্টকে উৎসাহিত করে এবং উভয় দেশের বাজারে পরস্পরের প্রবেশ নিশ্চিত করতে অশুল্ক বাধা দূর করবার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। এতে করে বিভিন্ন খাত যেমন পরিবহন, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, বন্দর, যোগাযোগ এসবে শক্তিশালী এবং উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে আমরা আমাদের দেশীয় শিল্পকে নিয়ে দাঁড়াতে পারব কী– সেই প্রশ্ন টিফার আলোচনায় একটি জরুরি প্রশ্ন।

চুক্তির ১৫ নং ধারা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে। গোটা দুনিয়াতে মানুষের জ্ঞানের-শ্রমের পরম্পরাকে অস্বীকার করে, মানুষের নিষ্ঠাকে পণ্য বানিয়ে ব্যক্তিমালিকানার যুগ জারি রাখতে চায় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকারকে। প্রাণের উপরও আজ পেটেন্ট জারি করা হচ্ছে। আদিবাসী লোকায়ত জ্ঞানকেও পেটেন্ট করেছে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো। ঘটনা হলো যে, ডব্লিউটিও-এর আওতায় বাংলাদেশ-সহ অন্যান্য এলডিসি দেশগুলো ২০১৩ সাল পর্যন্ত ট্রেড মার্ক কপিরাইটে পেটেন্ট ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সম্পর্ক আইনের আওতার বাইরে থাকার সুযোগ পেয়েছে। ফার্মিসিউটিক্যালস্‌গুলো পেয়েছে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাইরে থাকবার সুযোগ। কিন্তু টিফা বাস্তবায়িত হলে সেটি যেহেতু বহুপাক্ষিক চুক্তির থেকে অগ্রাধিকার পাবে সেহেতু ১৫ নম্বর ধারার বদৌলতে দেশের ওষুধ-কম্পিউটার-সফট্‌ওয়্যার-সহ অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ মার্কিন কোম্পানিগুলোকে পেটেন্ট-ট্রেডমার্ক-কপিরাইট-এর মূল্য দিতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাবে কিনা?

বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা অবশ্য বলতে পারেন বাংলাদেশও তো এসব সুবিধা পাবে। কিন্তু বাংলাদেশের বাণিজ্যখাত এতো শক্তিশালী এবং উন্নত নয় যে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এসব সুবিধাদি ভোগ করতে পারবে। এই চুক্তির আরেকটি ভয়ানক জায়গা হলো আর্টিকেল ৪, যার শেষ লাইনে বলা আছে, 'কোনো অবস্থাতেই কোনো পক্ষ এককভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যা দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্যে ও বিনিয়োগে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। কোনো পক্ষ

বলতে বাংলাদেশই নির্দেশিত হয় কেননা বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে দুর্বল এবং চুক্তিগুলোতে দুর্বলরা বরাবরই ভূক্তভোগী।

বস্তুত দুর্বল রাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ বাজার প্রতিষ্ঠা করা এবং সাম্রাজ্যবাদী বাসনা চরিতার্থ করবার সুবিধার্থে প্রাইভেটাইজেশন উদ্বুদ্ধকরণ, বাজারের উদারীকরণ, বাজারকে গতিশীল করা এবং এই দেশে মার্কিন বাজারকে নিরঙ্কুশ করার অভিপ্রায় আর টিফা চুক্তিকে আমরা আলাদা করতে পারি না। বাজার-অর্থনীতির মুমূর্ষুতা, ভঙ্গুরতা, অন্তসারশূন্যতা প্রতিপন্ন হয়ে যাবার এই কালে, তাকে টিকিয়ে রাখবার আয়োজনে বাংলাদেশকে বলির পাঠা বানানোর প্রক্রিয়ার সাথে টিফা চুক্তিকে আলাদা করা যায় না।[৩] বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের যেমন করে দারিদ্র্যের ভয়াবহতার সম্মুখীন করেছে তেমনি করে সম্মুখীন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ অন্যান্য দৈত্যদানব রাষ্ট্রের আরও বেশি আধিপত্যশীল আগ্রাসী মনোভাবের। এখন ক্ষমতাশালীরা স্বভাবতই তাদের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো-সহ নিজেদের অর্থনীতি বাঁচাতে দুর্বলদের উপর আধিপত্য করবে। টিফা যে সেই শর্ত বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশে একটি টুলস হিসেবে কাজ করবে না– তেমন নিশ্চয়তা পাই না আমরা।

ট্রানজিট

ভারতের সাথে নৌ ও রেলপথে সীমিত পর্যায়ের ট্রানজিট ব্যবস্থা আগে থেকেই রয়েছে। এখন সড়কপথে ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশের মাঝ দিয়ে ভারতেরই অন্যান্য রাজ্যে পরিবহনের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হবার কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ এটাকে ট্রানজিট কেউ কানেকটিভিটি কেউ করিডোর নামে ডাকছেন। এরমধ্যে ট্রানজিট শব্দটির একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজ তাদের দিক থেকে এবং সর্বাগ্রে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অবস্থান থেকে ট্রানজিটের বিরোধিতা করছিলেন দীর্ঘদিন যাবৎ। সঙ্গত কারণে ট্রানজিট মানেই ভারতের কাছে দেশ বেচে দেবার পায়তারা– এই মনোগঠন তৈরি হয়েছে দেশের মানুষের মনে। তাই হুটহাট করে ভারতের বাণিজ্য সচিব এপ্রিলের মাঝামাঝি বাংলাদেশে আসলেন একেবারে বিনা নোটিশে এবং সাংবাদিকদের কাছে ট্রানজিট প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বলছেন যে না, ট্রানজিট নিয়ে আলাপ হয়নি। কানেকটিভিটি নিয়ে আলাপ হয়েছে। এই কানেকটিভিটি শব্দটির অভিধানগত অর্থ খুঁজে বের করেছেন অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ। তিনি ওয়েবস্টারস: নিউ টুয়েনটিথ সেঞ্চুরি ডিকশনারির দোহাই দিয়ে বলছেন কানেকটিভিটি হলো, that which connects অর্থাৎ যেকোনো যোগাযোগের পথ। তিনি দেখিয়েছেন শব্দটি ট্রানজিটের থেকে বিস্তৃত পরিসরের।[৪] সেই অর্থে ট্রানজিট নিয়ে যারা ভীত তাদের ঐ কানেকটিভিটি নিয়েও যথেষ্ট ভীত হবার জায়গা আছে।

পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের এই ঐতিহাসিক যুগপর্বে যখন মুক্তবাজারের নাম করে ক্ষমতাশালীরা নিজেদের দেশে সংরক্ষণশীলতা জারি রাখেন আর অন্যদেশের বাজারে

অবাধে প্রবেশ করবার সুযোগ নিতে থাকেন তখন সত্যিকার অর্থেই যদি আঞ্চলিক ঐক্য গঠন করে নিষেধের বেড়াজালগুলো তুলে ফেলা গেলে তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মঙ্গলের হতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিশালীতম রাষ্ট্র ভারতের সাথে কানেকটিভিটি আদতেও কতটা দেশের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তর, বিভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, তালপট্টি দ্বীপ জবর-দখল এবং সমুদ্রসীমা নিয়ে অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি ও সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শন, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ, অবৈধ অভিবাসী ইস্যুতে অযৌক্তিভাবে সংখ্যা বাড়িয়ে বলা এবং অপমানজনক পুশইন তৎপরতা, সীমান্ত নির্ধারণ ইস্যু– দীর্ঘদিন ধরে জারি থাকা এই সমস্যা নিয়ে আমরা আজও ভারতের সাথে মীমাংসায় আসতে পারিনি। ওদিকে সেভেন সিস্টারস খ্যাত ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলো আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার, তাদের উপর আগ্রাসী রাষ্ট্রের আধিপত্য বাড়াতে এই কানেকটিভিটি যদি কাজে লাগানো হয় তো তা একদিকে স্বাধীনতাকামী একটা জনগোষ্ঠীর সাথে বেঈমানি অপরদিকে এই বেঈমানির প্রতিশোধ নিতে উস্কে দেবে এই প্রক্রিয়া। এছাড়া গুরুতর যে বিবেচনা সেটা হলো ভারত চুক্তি করে কিন্তু চুক্তি মানে না। (পাঠক, এটা কিন্তু ভারত-বাংলাদেশের মামলা না, মামলাটা ক্ষমতশালী আর দুর্বলের। দুর্বল রাষ্ট্র সবসময়ই চুক্তির ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়।) ট্রানজিটের কিংবা কানেকটিভিটির প্রশ্নেও সেই বিবেচনা আমাদের মাথায় থাকা দরকার। ওদিকে বিএনপি নেতা হান্নান শাহ যথার্থই অভিযোগ করেছেন, বর্তমানে ভারত বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানার তালপট্টি এলাকা দিয়ে ১০ হাজার মাইল ভেতরে প্রবেশ করে তেল-গ্যাসের অনুসন্ধান চালাচ্ছে। তো এই যদি হয় অবস্থা তাহলে চুক্তির কী দাম থাকতে পারে? এই প্রশ্ন আমরা এড়াতে পারি না। সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন আজকের বাজার-অর্থনীতির কালে ফালতু একটা প্রশ্ন। ট্রানজিটকে সেই বিবেচনায় বিচার করব না আমরা। তবে খেয়াল রাখাটা জরুরি এই কানেকটিভিটি গোটা দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবাদকে বিশ্বায়িত করবে কিনা, মানে পরিষ্কার করে বললে দক্ষিণ এশিয়ায়িত করবে কিনা।

টাস্কফোর্স

দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী টাস্কফোর্স গঠনের ব্যাপারেও ফেব্রুয়ারি পর্যন্তকথা চালাচালি হচ্ছিলো। এখনও সেটা গঠিত হয়নি কিংবা হলেও জনগণের সামনে প্রকাশ করা হয়নি। সেটারও কোনো পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা আমাদের সামনে হাজির করা হয়নি। তাই আমরা জানি না, কী দাঁড়াবে সেটা। কিন্তু যা কথা চালাচালি হচ্ছিলো, রিচার্ড বাউচার যেমন করে গদগদ প্রশংসা করছিলেন সেই উদ্যোগের তাতে আমরা এই শঙ্কা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারি না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী নয়া যুদ্ধের ফর্মূলার সাথে যোগাযোগটা ঘনিষ্ঠ হবে কিনা। গোটা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র যেমন করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নাম করে যুদ্ধবাজ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে এবং ভিন্ন বিশ্বব্যবস্থার প্রত্যাশীদের (সেটা ভালো হোক খারাপ হোক সেটা বিবেচনা

না) উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করে কিংবা করতে সাহায্য করে তাদের ধ্বংস করে দেয়, দক্ষিণ এশিয়ায় সেই ধ্বংসসাধনের মতাদর্শিক এবং সামরিক-সাম্রাজ্যিক বাসনা হবে কিনা এই টাস্কফোর্স; সেই প্রশ্ন আমরা এড়াতে পারি না। দক্ষিণ এশিয়ায় বাজার-অর্থনীতি সৃষ্ট তীব্র সামাজিক অসমতা, সিআইএ আইএসআই-এর প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করা জঙ্গিরা, ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে লড়াইরত স্বাধীনতাকামীরা, দেশে দেশে পাহাড়ে-সমতলে নিপীড়িত আদিবাসীরা, তামিল-এলটিটি-সহ বাজার-ব্যবস্থার পরোক্ষ ফলাফল হিসেবে জারি থাকা যাবতীয় সন্ত্রাসবাদকে (এদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদী নয়) বলপ্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে নাকি সমস্যার গোড়ায় চোখ না রেখে বলপ্রয়োগ করলে সেই সন্ত্রাসবাদকে আরও বাড়বারই সুযোগ তৈরি করে দেয়া হবে; এই প্রশ্নও এড়াতে পারি না আমরা।[৫] আমাদের কাজ যে যেভাবে যতোটা পারি রাষ্ট্রের দিকে এই প্রশ্নগুলো ছুড়ে দেওয়া। আমরা যারা সমাজের সুবিধাভোগী অগ্রসর সেই তাদের।

পরিশেষ

জনগণকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে রাখবার এবং রাখতে পারবার কলাকৌশল এবং সেই বাইরে রাখার মাধ্যমে গোটা দুনিয়াটাকে একটি ভোগবাদী খাদক দুনিয়া বানিয়ে, মানুষকে নয়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে উৎপাদনের উপজীব্য হিসেবে জারি রেখে বিশ্বায়নের নাম করে যে অর্থনৈতিক স্বৈরতন্ত্র জারি রাখা আছে রাজনৈতিক কৃর্তত্বের মাধ্যমে; সেটাকে বহাল রাখতেই টিফা-ট্রানজিট-টাস্কফোর্স– এই তাহলে মোদ্দা কথা। তাই যারা বারবার বলার চেষ্টা করছেন ট্রানজিট কিংবা টিফা অর্থনৈতিক বিষয়, রাজনৈতিক নয় তারা মিথ্যে বলছেন। কিংবা খেয়াল করতে পারছেন না, অর্থনৈতিক চুক্তির বাস্তব প্রতিফলন ঘটে রাজনীতির মধ্যে দিয়েই আরও নির্দিষ্ট করে বললে ক্ষমতা-সম্পর্কের মাঝ দিয়েই। দুর্বল দেশের সাথে অর্থনৈতিক চুক্তি যখন পরাশক্তির দ্বারা অমান্য করা হয় তখন সেটা রাজনৈতিক ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ; অর্থনৈতিক নয়। আমাদের কাজ তাই জনসক্রিয়তার প্রশ্নটাকে একেবারে সামনে নিয়ে আসা। জনগণ যে নিজেদের পরিচালিত করতে পারে না সেটার প্রধানতম কারণ হলো জনগণ নিজেকে নিজে পরিচালিত করবার সুযোগ পায় না। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণ নেই বলে। যে মানুষ ক্রিকেট নিয়ে বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে পারে সে কেন বুঝবে না কোন চুক্তি তার জন্য ভালো আর কোনটা খারাপ? টিফা-ট্রানজিট-টাস্কফোর্স চুক্তি হলে লাভ হবে না ক্ষতি হবে সেই মোদ্দা কথাটা কে বুঝবে না?

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে তাই একটি সত্যিকারের অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক সমাজকাঠামো দরকার আমাদের। নাহলে শূন্য বাংলাদেশ নির্মাণের প্রকল্প থেকে আমরা রেহাই পাবো না। একটিবারের জন্যও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না; জনগণের সক্রিয়তা ছাড়া কোনো মঙ্গলকর প্রত্যাশিত সমাজের রূপকল্প দাঁড়াতে পারে না।

টীকাভাষ্য ও অন্যান্য

১. দেখুন, বাধন অধিকারী, এসো বাংলাদেশ গড়ি/ সেনা কর্পোরেট কর্তৃত্বের গাড়িতে চড়ে বাংলাদেশের নিও লিবারাল দুনিয়ায় ভ্রমণ পর্ব, *সাগ্নিক*, তৈমুর ফারুক তুষার সম্পা.২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

২. দেখুন, Noam Chomsky, *Whats Makes Mainstream Media Main Stream*, chomsky.info

৩. বাজার-অর্থনীতির সংকট নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দেখুন, বাধন অধিকারী ও তানজিনা ফেরদৌস তাইসিন, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকট/ পুঁজির কেন্দ্রে সতর্কবার্তা ও প্রান্তে নিও লিবারাল প্রজেক্ট বাস্তবায়ন পর্ব, ইউকে *বেঙ্গলি*, http://www.ukbengali.com/Literature/Features/Fea20081018-Taisin-Adhikari-on-credit-crunch.htm

৪. দেখুন এম এম আকাশ, 'ট্রানজিট' না 'করিডর' না 'কানেকটিভিটি', ২৪ ফেব্রুয়ারি *প্রথম আলোর* সম্পাদকীয় পাতা

৫. প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দেখুন, বাধন অধিকারী ও তানজিনা ফেরদৌস তাইসিন, নিও লিবারাল দুনিয়ায় সন্ত্রাসবাদের বীজ এবং আমাদের লড়াইয়ের প্রশ্ন, ইউকে *বেঙ্গলি*, http://www.ukbengali.com/Literature/Features/Fea20081225-Tanzina-Taisin-Badhon-Adhikari-on-Neo-liberalism-and-Terrorism.htm

দ্রষ্টব্য: (লেখা আদতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এই লেখা শুরু করা থেকে ছাপাখানায় যাওয়া পর্যন্ত যে পর্যায়গুলো অতিক্রম করবে, সেখানে শ্রমিকতার প্রশ্নে, যে সফটওয়্যার ব্যবহার করে এটা লেখা হলো সেই সফটওয়্যারের নির্মাতা বা তারও আগের কম্পিউটারের আবিস্কারের সাথে যুক্ত লোকজন বা তারও আগের কম্পিউটারের পূর্ববর্তী আনুষঙ্গিক যাদের দ্বারা আবিস্কৃত; এমনকি লোহা আবিস্কারের আবিস্কারকেরা থেকে শুরু করে যেখানে ছাপা হলো সেখানকার বাইন্ডিংয়ের কর্মীরাসহ যাদের যাদের জ্ঞানগত পরম্পরার উত্তরাধিকার আমরা; তাদের সবাই লেখার অংশীদার। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিমালিকানার যুগ রচয়িতা নামে আলাদা সত্তা নির্মাণ করে। লেখাকে পরিণত করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। আমরা সেই পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মাঝে দাঁড়িয়ে যৌথতার অনুশীলন করবার চেষ্টা করছি, যৌথভাবে লিখে। কখনও ব্যর্থ হচ্ছি, কখনও সফল হচ্ছি। এখনও পর্যন্ত আমরা ব্যক্তিমালিকানাকে অস্বীকার করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বেনামে লেখা প্রকাশ করবার ঐতিহাসিক দায়িত্বটি শুরু করতে পারিনি। কবে পারব সেটাও এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কিন্তু উল্লেখ করাটা জরুরি হয়ে পড়ে বন্ধু শাশ্বত আর রূপম পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের হাতে দিয়েছিলো, রাজশাহীর *সমকাল* পত্রিকার ব্যুরো অফিস থেকে পত্রিকার তথ্য সংগ্রহ করে তা ফটোকপি করে দিয়েছে পিতম। যেগুলো ছাড়া এই লেখা রচিত হতো না। আর একজন বাধন আহমেদ। আমার নামের সাথেও যার অনেক মিল। ও এই রচনার সাথে সবটাসময় জড়িয়ে ছিলো। ওদের ভালো হোক!

প্রমিথিউস; ২০০৯

মার্কেট-মিডিয়া-মিলিটারি যুগের বাংলাদেশে মেসি-মনমোহন-মমতারা... কিংবা আমরা

১/১১ তে ইয়াজউদ্দিন-ফখরুদ্দীন-মঈনউদ্দীন গং *এসো বাংলাদেশ গড়ি* নামের সেনা-কর্পোরেট কর্তৃত্বের গাড়িতে করে গোটা দেশটাকে নিও লিবারাল দুনিয়ায় ভ্রমণ করাতে শুরু করেছিল। নিও লিবারাল জরুরি আইনের শাসনের সেই ভাইরাস নিয়ে ক্ষমতায় আসীন আওয়ামী নের্তৃত্বাধীন সরকারের আড়াই বছরে এসে দক্ষিণ এশিয়ার প্রভুরাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী সদলবলে বাংলাদেশে এলেন ২দিনের জন্য। এলেন না মমতা। রাজ্যের স্বার্থরক্ষার রাজনীতি করলেন! ওদিকে ফুটবল জোয়ারে ভাসাতে এলেন মেসি! খেলতে আসেননি কিন্তু; বিশ্ব পুঁজির খেলনা হয়ে খেলাতে এসেছেন। তিস্তা নদীর জলের জোয়ার নিয়ে চিন্তিত হব কেমনে? ফুটবল জোয়ারে দিশেহারা না হয়ে উপায় কোথায়! মিডিয়া তাই খবর লেখে, মেসিদের দেখতে মাঠে তরুণীদের ভীড়।

বিশ্বপুঁজির এক খেলনা হয়ে মেসিরা যখন খেলা দেখাচ্ছেন তরুণীদের তখন ভূ-রাজনীতি আর বাণিজ্যের রাজনীতির ট্রানজিট কিংবা ট্রানশিপমেন্ট কিংবা করিডর নিয়ে শেষ খেলা দেখাতে পারলেন না মনমোহনরা। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি আর নগ্ন হতে পারলো না। বলতে হলো তাদের, তিস্তার পানি না দিলে ট্রানজিট দেব না। পত্রিকাগুলো লাফিয়ে উঠলো। দৃষ্টিআকর্ষক শিরোনাম দেখলাম অনলাইন পত্রিকাগুলোতে আর পত্রিকার অনলাইনগুলোতে। তিস্তার পানি আর ট্রানজিট খেল মেসি-খেলের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। আমাদের মস্তিস্কে এই সম্মতি উৎপাদিত করবার চেষ্টা করা হল যে, পানি পাইনি তাই ট্রানজিট দেইনি। ট্রানজিট আর তিস্তার দাড়িপাল্লায় মিডিয়া স্বয়ং বসে পড়লো তিস্তার পাল্লায়, পাল্লাটা এমন ভারী করল যে ট্রানজিট আর তিস্তার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-ভৌগলিক স্বার্থ সমান হয়ে গেল! ট্রানজিট ভারত নেবে, মমতার রাজনীতি পেরিয়ে সিকিভাগ জল হয়ত আমরা পাব চুক্তি আকারে, কিন্তু বাস্তবে নয়। চুক্তি থাকলেও গঙ্গার জল যেমন ফারাক্কা পেরিয়ে গড়িয়ে পানি হয়ে আসে না পদ্মায় হিস্যা-অনুযায়ী।

শুকিয়ে যাওয়া পদ্মার পার ধরে তবু হাঁটি কেউ কেউ। বর্ষায় একটু জল বাড়তেই আনন্দে উৎফুল্ল হই! বর্ষা শেষে আস্তে আস্তে জল কমে চর জাগতে শুরু করলেও মনুষ্যপ্রেমের জোয়ার থামে না! পদ্মা নদীর শরীরে আস্তে আস্তে বড় বড় চর পড়লেও মনুষ্যপ্রেমে চর পড়ে না। বরং জোয়ার আসে কান্না-হাসিতে, ভালোবাসাবাসিতে! বিশ্বপুঁজির লীলা দেখাতে মেসি-মনমোহনদের জোয়ার এড়িয়েই আমরা কেউ কেউ এখনও কাঁদি-হাসি... এখনও ভালোবাসার জোয়ারে ভাসি!

এইসব রাজনীতি, এইসব চুক্তি, এইসব জল আর পানি, এইসব গঙ্গা আর পদ্মা, এইসব বিএসএফ-বর্ডার গার্ড তাই শেষ কথা নয়!

ফেইসবুক; ২০১১

মিডিয়াচারণ: কৃষ্ণকলির গান থেকে বিজ্ঞাপনে ...

"বন্ধু এসো স্বপ্ন আঁকি/চারটে দেয়াল জুড়ে/বন্ধু এসো আকাশ দেখি/পুরোটা চোখ খুলে/বন্ধু এসো জলে ভাসি/বুক ভাসানোর সুখে"... গাইলেন কৃষ্ণকলি। কৃষ্ণকলি; এই কালের কণ্ঠস্বর। দেখবার, জানবার আর ভাসানোর সুখে ভাসবার ইচ্ছেটা মরে যেতে যেতে প্রাণ পায়। গান শোনা শেষে টিভি সেটের সামনে আসি। টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখি, ক্লোজ আপের বিজ্ঞাপন। প্রেম নিবেদন করছে তরুণ। তরুণী বলল, ফাঁকা নাই। প্রেম করবে না– সমস্যা নাই। তবে ছেলেটি একটা ক্লোজ আপ চেয়ে বসল মেয়েটির কাছে। মেয়েটি তাকে ক্লোজ আপ কিনে দিলো আর সেই ক্লোজ আপের সাথে ফ্রি পাওয়া সানগ্লাস চোখে পড়ার পর ছেলেটির পিছু লাগল ৬টি মেয়ে। পাঠক বন্ধু, এই বিজ্ঞাপনে আপনি দেখতে পারছেন কি ভালবাসা পাবার বদলে একটা সানগ্লাস পাওয়াতেই লাভ। এই বিজ্ঞাপন আপনাকে শেখাচ্ছে বাজার আপনাকে ভালবাসার বিকল্প দিতে পারে। মেয়েটির ভালবাসার বদলে বাজারে ক্লোজ আপে অনেক মঙ্গল হতে পারে একটা ছেলের। সানগ্লাসেই প্রেম হয়। এটাও কিন্তু বলছে এই বিজ্ঞাপন। কেননা, ছেলেটি সানগ্লাস পড়াতেই ৬টি মেয়ে তার পেছনে লাগে। তীব্র পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও কিন্তু কাজ করেছে এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে। মেয়েরা তাদের ভালবাসার পুরুষকে বাছতে গিয়ে বিবেচনা করে তার সানগ্লাসকে। আকর্ষণীয় অবয়বকে। আর কিছু তেমন একটা বিবেচ্য না। এটাও কিন্তু বলতে চাইল বিজ্ঞাপনটি।

বিজ্ঞাপনটি দেখি, ভাবি... আবার কৃষ্ণকলির গানে মেলাতে চাই তাকে... "হাজারে হাজারে মানুষ বাজারে/ বাজারে স্বপ্ন ঝুলি/একা একা আজ/থেকে হাহাকার/কী করি কী করি"... আহত হই। মৃত হয়ে যাই। স্বপ্ন বেচা-কেনার খতিয়ান করি এই কালের মানুষের। বিশেষত এই কালের তরুণ-তরুণীর। বিশেষত এই আমাদের। বাজারে স্বপ্ন বেচে কর্পোরেট পুঁজিবাদ। আমরা সেই স্বপ্নের নিরূপায় গ্রাহক। তিরিশ পয়সায় নিশিরাতে প্রেম কিনি। একটা ডিভিডিতে পুরো রবীন্দ্রনাথকে কিনে ফেলি। হতাশা কিনি উপন্যাস-কবিতা-নাটকের নামে। জিন্স-টি শার্ট-শর্টস কিনি আধুনিকতার নামে। হতাশা মোচনের অস্ত্র কিনি আশাবাদী সাহিত্যের নামে, ক্ষয়ে যাবার যন্ত্র কিনি হুইস্কি-ইয়াবার নামে। যৌনতা কিনি সিনেমার নামে। আবার এইযে, কৃষ্ণকলির গান নাম দিয়ে ইথারে ভাসা ওর স্বরের কম্পাঙ্কগুলোকে একজায়গায় করে গান পুনরুৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলো যখন বিক্রি করে সেটা কিনি গানের নামে। আবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি কৃষ্ণকলির গানে গানে। ঐ একই গানের পরের অন্তরায়। গাইছেন কৃষ্ণকলি ..."তবু বুক পেতে রেখে/ভালবাসা দেখে/আয় ছুয়ে আয় বাঁচি/তবু বন্ধু ভালোবেসো একবার/যা ছিলো সব দিয়েছি দেবার"... চেষ্টা করতে করতে জীবিত হতে চেষ্টা করি। দেবার যা ছিলো আমার অবশিষ্ট আছে কি তার কোনো কিছু... সবই দিয়ে দিয়েছি। বেশিরভাগটাই দিয়েছি বাজারে। খানিকটা তার অন্যখানে। ভালবাসায়। মনুষ্যচেতনায়। সেখান থেকেই উত্থিত হয় আকাঙ্ক্ষা,"তবু বন্ধু ভালোবাসো একবার"... ঐ মনুষ্যচেতনাই বাজারের বিপরীতে প্রেমের সুর হয়ে ভেসে আসে

কৃষ্ণকলির কণ্ঠ বেয়ে। শুনতে পাই, "বন্ধু এসো স্বপ্ন আঁকি/চারটে দেয়াল জুড়ে/বন্ধু এসো আকাশ দেখি/পুরোটা চোখ খুলে/বন্ধু এসো জলে ভাসি/বুক ভাসানোর সুখে ..."।

পুরো চোখ জুড়ে আকাশ দেখবার সুযোগ কি যার আছে আমাদের, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে কৃষ্ণকলিকে। আকাশে যুদ্ধবিমান। আকাশে স্যাটেলাইট। আকাশে ভেসে ভেসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসে আমাদের দেশে; আসে সংস্কৃতি হয়ে। ভারত আসে ঐশ্বরিয়া হয়ে। আকাশে ভেসে বেড়ায় মুনাফাবাজ কেনো উৎপাদনক্ষেত্রের ক্ষতিকর ধোঁয়া। হায়রে আকাশ আমার। হায়রে আমার চোখ। হায়রে চোখ আমাদের। চোখ। মানে আমার দৃষ্টি। আমার জগৎ দেখবার চোখ। সে চোখ মুনাফা দেখে। স্বার্থপরতা দেখে। সে চোখ দেখে হত্যা-সন্ত্রাস-ধর্ষণ-অসাম্য আর থকথকে থেকে থকথককেতর হয়ে উঠতে থাকা আমাদের মনুষ্যচেতনা। সে চোখ থ্রি-এক্স দেখে, ভিডিও গেম দেখে।

চোখ চাইলেই আবার অন্য কিছুও দেখতে পারে। বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধের জোয়ার দেখতে পায়। বাজারের যুগকে অস্বীকারের মাঝ দিয়ে আরেকজনের চোখে জমে থাকা জলকে দেখতে পায় চোখ। অভিমানের গলা পেরিয়ে আরও আরও মিলিত হওয়া... আরও আরও বন্ধুত্ব... অপরের জন্য সহমর্মিতা... বন্ধুর কষ্টে তীব্র বেদনাবদ্ধ হওয়া ... আরও কতো কী যে দেখতে পায় চোখ। শীতার্ত-বন্যার্ত-ক্ষুধার্ত-নিপীড়িত মানুষ দেখতে পায়। সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে খোয়াড়ে (ছাত্রী হলে) ঢুকতে বাধ্য হওয়া বন্ধুটির হাহাকারকে দেখতে পারে। বন্ধুদের চমৎকার সব সম্পর্কের মাঝে, প্রেমের মাঝে অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেখতে পায়, স্বপ্নে দেখতে পায় ঐ প্রজন্ম অপেক্ষাকৃত আরও মুক্ত মানুষের কোনো পৃথিবী বানিয়ে ফেলেছে।

পুরোটা চোখ জুড়ে আকাশ দেখতে চাইলেই দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না সবটাসময়– কৃষ্ণকলি জানেন কী। জানেন কি তিনি, চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকাতে গেলে চোখ তুলতেই বিশাল এক বিলবোর্ড চোখে পড়তে পারে। সেটাতে লেখা থাকতে পারে 'রেক্সোনা ব্যবহার না করলে হাত না তোলাই ভালো'। মানে আপনার হাতটা তোলার অধিকারও আর আপনার নেই। সেটা তুলতে গেলে রেক্সোনা ব্যবহার করতেই হবে। মানে রেক্সোনার কাছে আমার স্বাধীনতাকে সপে দিতে বলে এই বাজার-অর্থনীতি। নড়াচড়ার অধিকারটিও আমাকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে আজ– ঐ বিজ্ঞাপন সেই মেসেজ আমাদের সামনে হাজির করে। ইচ্ছে করলেই আমি হাত তুলতে পারব না। হাত তুলতে গেলে অবশ্যই আমাকে কিনতে হবে পণ্য। বিনিময়ে আমি অর্জন করবো হাত তোলার অধিকার। আর যদি ব্যবহার না করি রেক্সোনা। যদি অস্বীকার করি স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে। তখন কৃষ্ণকলি সঙ্গী হয় ভাবনার। ও দীপ্ত কণ্ঠে গেয়ে শোনাবে আপনাকে – "ইচ্ছে মতোন ইচ্ছেগুলি করছে ওড়াওড়ি/ইচ্ছেমতোন ঘোরাও লাটিম/ইচ্ছেমতোন ঘুড়ি "... ইচ্ছে আর স্বাধীনতা।

ইচ্ছে আর স্বাধীনতাও আজ বাজারে কেনাবেচা হয়। স্বাধীনতা দিবসে সেলফোনের কোম্পানি ঘোষণা করে একটেল স্বাধীনতা। তিরিশ লাখ শহীদের রক্ত আর ২ লাখ নারীর উপর যৌন নিপীড়নের[১] দাম দিয়ে যে সার্বভৌম রাষ্ট্র আমরা বানিয়েছিলাম সেটার স্বাধীনতাকে বন্দী করে ফেলতে চায় সেলফোনের কোম্পানি। আর ইচ্ছে, ওটা এখন তৈরি হয় সম্মতি উৎপাদনের যন্ত্রে। মিডিয়াতে। ইচ্ছে তৈরি করে বাজার। বাজারই স্বয়ম্ভু। বাজারই খোদা হয়ে উঠতে চায়, কী পড়ব, কী খাব, ঘুমাবো কোথায়, লাইফ স্টাইল কী হবে, কোন সাবান ভালো, সেটার বেশিরভাগটাই ঐ বাজারই নির্ধারণ করে দেয় মিডিয়ার মাঝ দিয়ে। ইচ্ছে মতন ইচ্ছে ঘুড়ি ওড়াওড়ি করতে পারে কি, কৃষ্ণকলি? তিরিশ পয়সায় রাতভর ফোনে প্রেমালাপ করবার ইচ্ছেটাও কিন্তু আপনি নিজে নির্ধারণ করেন না বন্ধু, নির্ধারণ করে সেই কোম্পানি। নির্ধারণ করে তিরিশ পয়সায় কথা বলবার সুযোগ করে দিয়ে। টিভি সেটে জিঙ্গেল বেজে ওঠে, 'দেশ দেশ দেশ... বাংলালিংক দেশ...' শুনে মনে হয় দেশটা বুঝিবা বাংলাদেশ না; দেশটা বুঝিবা বাংলালিংক দেশ।

ব্রাহ্মণ্যবাদ আর বর্ণপ্রথার কাল থেকে পাকিস্তানি সামরিক আধা-সামরিক বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাবার আগ পর্যন্ত বাংলার মুসলমান কৃষকের, বাংলার নমশুদ্রের মুক্তির আন্দোলনের মাঝ দিয়ে অর্জিত এই বাংলাদেশ নামক দেশটি এখন বাংলালিংক নামক এক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের। প্রতিনিয়ত দেশটার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে চলে বাজার-অর্থনীতির প্রবল দাপট। তবু কৃষ্ণকলিরা থেকে যায়। থেকে যায় প্রতিরোধ। গানে-কবিতায়-জীবনাচরণের মাঝ দিয়ে প্রতিরোধ রচিত হতে থাকে কোথাও কোথাও। কেউ কেউ উতালা হয়ে থাকে ইচ্ছেমতন ইচ্ছেঘুড়ি ওড়ানোর জন্য। ছোটকাগজ বের হয়। কানসাট-ফুলবাড়ি-গার্মেন্টস ঘটে যায়। তীব্র বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তুলে দেশের অর্থনীতিকে আইএমএফের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যান নিবেদিতপ্রাণ ক'জন অর্থনীতিবিদ, অ্যাকটিভিস্ট। জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকলেও চুক্তি করা সম্ভব হয় না ভয়াবহ ঐ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে।

ওদিকে সার্ফ এক্সেল শেখাতে চাইছে, 'দাগ থেকেই যদি দারুণ কিছু হয় তো ক্ষতি কী'। দাগ থেকে দারুন কিছ। সার্ফ এক্সেল ওয়ালারা জানে কি; জামার উপর যে দাগ পড়ছে সার্ফ এক্সেল দিয়ে সেটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেললেই দাগ চলে গেলেও মনের মধ্যে যে দাগ প্রতিদিন পড়তে থাকে সেটাকে সেই দাগকে সারানোর ক্ষমতা বাজারের নেই! সেই দাগকে চিনবারই ক্ষমতা নেই সার্ফ এক্সেলের। কিন্তু বন্ধু জানেন কি, সার্ফ এক্সেল; মানে আবেগ-প্রেম-অনুভূতি-ভালবাসা নয়, একেবারে সার্ফ এক্সেলই যদি হয় দারুণ কিছু হবার উৎসভূমি, সেই যদি হয় দাগ কাটবার সক্রিয়ক তাহলে ভালোবাসাকে আরেকবার আমি বিক্রি করে দিই বাজারে। ভালবাসা আর পণ্য সমার্থক হয়ে যায়। বন্ধু জানেন তো দাগ কেটে যায় হৃদয়েও। বাইরের দাগ থেকে নয়, দারুণ কিছু হতে পারে হৃদয়ে এঁকে যাওয়া দাগ থেকে। সেই দাগ ফেলবার কিংবা মুছবার

ক্ষমতা দৃষ্টিহীন বাজারের নেই। সেই সত্যিকারের দাগের যুগ শুরু করতে চাইলে প্রতিরোধ দরকার। সেই দাগ থেকেই হতে পারে সত্যিকারের দারুণ কিছু!

বিজ্ঞাপনের হস্তক্ষেপের কারণে দাগ পড়ে যদি আপনার হৃদয়ে, সেই দাগ থেকেই গড়ে উঠতে পারে প্রতিরোধ। কর্পোরেট পুঁজির তীব্র ক্ষমতার এই যুগ বাজার-বিজ্ঞাপনের এই যুগ অসংখ্য দাগ এঁকে যাচ্ছে প্রতিদিন আপনার আমার হৃদয়ে। সেই দাগগুলোকে চিনতে পারছি তো আমরা, প্রিয় বন্ধু! চিনতে পারলে কিন্তু সত্যিই দারুণ কিছু হয়ে যাবে। কৃষ্ণকলি, সঙ্গী হবে। ওর প্রার্থনা থাকবে। সেই প্রার্থনাকে আপনিই সঙ্গী করে নিতে পারবেন... "হঠাৎ একটা রোদ হয়ে যাও/একটা রোদ হয়ে যাও/আমার গা ছুঁয়ে যাও/আমার কান্না জমা/কান্না কান্না লাগে ..." পাঠক, দাগ থেকে, মানে সত্যিকারের হতাশা আর রোদ হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ঘটে যেতে পারে দারুণ কিছু। সত্যিই দারুণ কিছু!

শেষ কথা: পাঠক, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রাখার কালে কয়েকদিনের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে ওভাবেই তুলে ধরতে চেয়েছি আমি। একটি কথা বলার আছে। যদি প্রশ্ন করেন যে, বাজারের সম্ভাব্য বিকল্প এখন কী হতে পারে উত্তরে আমি বলবো জানি না। আমি আপাতত তাই বাজারকে চিনে নেয়ার কাজটাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। আর সেটা করতে গেলেই আপনাআপনিই প্রতিরোধ তৈরি হয়ে যায় বলে মনে করি। সেই প্রতিরোধকে অনেক বেশি সংগঠিত, অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট করবার এবং বিকল্প দাঁড় করানোর কাজের প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো তাকে চিনে নেয়া। আর হ্যাঁ, কৃষ্ণকলির গানগুলো নিয়েছি ওর *সূর্যে বাঁধি বাসা* নামের একমাত্র অ্যালবাম থেকে।

অন্তর্টীকা

১. স্বাধীনতা যুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী আর তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আল শামস্ বাহিনী যাদের উপর যৌন নিপীড়ন চালিয়েছে, সরকারী হিসেবে সেই ২লাখ নারীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে যখন আমাদের এই পুরুষশাসিত বাংলাদেশের ক্ষমতাশালী ধারা বলে বসেন যে, তাদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছি; তখন আমরা আরেকবার তীব্রভাবে পুরুষতান্ত্রিক মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটাই। এই মতামত সমাজে বিরাজমান এই ধারণাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে যে, যৌন নিপীড়িত হলেই নারীর সম্ভ্রমের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই মতামতের তীব্র বিরোধিতা করি।

অরোরা; ২০০৭

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক: নিও লিবারাল যুগের সম্পর্কের নেটওয়ার্ক

Facebook helps you connect and share with the people in your life. ভাষ্যটা ফেইসবুকের নিজেরই দেয়া। বলে নেয়াটা সঙ্গত হবে যে কিছুদিন আগে ফেইসবুককে যখন আমরা বন্ধুরা গ্রহণ করেছি ভালোভাবেই সেই সময়, পার্থ প্রতীম দাস এবং বাধন আহমেদ গল্পচ্ছলে যৌথভাবে একটি নোট দেন ফেইসবুকে। আর তা নিয়ে বিস্তর আলাপ ওঠে। সেই আলাপে শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক-বন্ধু সেলিম রেজা নিউটন এবং আমি পরস্পরের সাথে ভীষণ তর্কে মাতি। তর্কটা কেমন, কে ঠিক কে ভুল তার কোনো মীমাংসা নেই। সেই আলাপ আজ আর জরুরিও না। জরুরি হলো, ঐ আলাপের সময় সেলিম রেজা নিউটনের বলা একটি কথা। "ফেইসবুকের সবটা বুঝে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আর সবকিছু বুঝে ফেলে তারপর ভালোলাগা-না লাগা নির্ধারণ করে না মানুষ।" বলেছিলেন তিনি, "ফেইসবুক 'পুরোটা' দেখার পর সে সম্পর্কে ভালো লাগা জানাতে হলে, এ জীবনে তা আর সম্ভব হবে না। পুরোটা জানার বাসনা কোত্থেকে আসে? এর সাথে মহাতত্ত্ব-নির্মাণ-প্রবণতার সম্পর্ক আছে। জানার অহঙ্কারের অর্থ কী আসলে? সারা দুনিয়ার কোনো কিছুই বলতে গেলে আমরা পুরোটা জানি না। অথচ আমাদের ভালো লাগা খারাপ লাগা থেমে থাকে না।" তার এই কথাগুলোর সাথে আমি একমত ছিলাম। কিন্তু ভালোলাগা খারাপ লাগাই শেষ কথা হয় না। নিজের পরিসরে, নিজের-নিজেদের মাঝে, সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমকে নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে চিনে নিতে হয়। সেটা মহাতত্ত্ব নির্মাণের ঝোঁক, কিংবা ফেইসবুককে পুরোটা বুঝে নেবার বাসনা নয়, নিজের পরিসরে তাকে চিনতে চেষ্টা করা। এই আলাপ সেই চেষ্টারই বাস্তব অনুশীলন।

সেলিম রেজা নিউটনের সাথে পরিপূর্ণ ঐকমত্য রেখে বলতে চাই, ফেইসবুকের সবটা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। সেটা খুবই ঠিক কথা। যাইহোক, ফেইসবুকের প্রাযুক্তিক দিক, নেটওয়ার্ক হিসেবে তার সামাজিক পরিসর এসবও আমার আলোচ্য না। কিন্তু আমার চোখের সামনে ফেইসবুকের যে আদল, আমার সাথে যাদের সম্পর্কের নেটওয়ার্ক, তাদের মাঝে এই নয়া প্রযুক্তির প্রভাব এবং নয়া প্রযুক্তিকে ঘিরে সেই মানুষগুলোর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারলে একটা নির্দিষ্ট পরিসরে ফেইসবুক নামের সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমকে চিনে নেয়া যাবে। এই লেখাটা সেই জন্যই তৈরি করতে বসা। যতোটুকু যা দেখতে পাই, তার একটা ছোট্ট বর্ণনা হাজির করবার বাসনায়।

ফেইসবুক যেন বাস্তব জগতের খণ্ডিত প্রদর্শনযন্ত্র

সব পাওয়া যায় ফেইসবুকে। মান-অভিমান-বন্ধুত্ব-শত্রুতা-ইগো-সেক্স-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অঙ্গীকার-যন্ত্রণা-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-লটারি-জন্মদিন সব। বলে নেয়াটা খুব জরুরি যে, ব্রাত্যজনের অধিকার যেহেতু এখনও অর্জিত হয়নি নয়া

যোগযোগের প্রযুক্তিতে, তাই সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যম ফেইসবুকেও আমরা উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্তকে পাই। এই মাধ্যম তাই আজও একটি এলিটীয় মাধ্যম, এইটুকু বলে না নিলে অন্যায় হয়। উচ্চবিত্তের সময় নেই, টাকার পেছনে ছুটতেই তার সবটা সময় যায়। তাই ফেইসবুকে তাদের খুববেশি দেখা মেলে না, বিশেষত পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা বেশি সত্য, পুরুষের সাথে পুঁজির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণেই। মধ্যবিত্ত টাকার পেছনে ছুটতে নাভিশ্বাস তুলে ফেললেও তার সময়ও আছে। তাই ফেইসবুক মূলত আমাদের এই বাংলাদেশের বাস্তবতায় মধ্যবিত্তেরই যোগাযোগ মাধ্যম। আর প্রবাসীরা তো আছেই। দেশের সাথে, মাটির সাথে, মমতার সাথে তার সংযোগ ঘটাবার জন্য এই মাধ্যম এখন একটি অতুলনীয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। যাই হোক, আমার বছর খানেকের অভিজ্ঞতায় ফেইসবুককে যেমনটা চিনলাম, তারই একটি বিবরণ হাজির করছি।

একাকীত্বের যন্ত্রণাময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

ফেইসবুকের স্ট্যাটাসগুলো খেয়াল করলেই একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট হয়। আসলে কেউ ভালো নেই। একাকীত্ব আর অস্থিরতা, মন খারাপ আর যন্ত্রণা, বিবর্ণতা আর বিষণ্নতা যতোটা পাওয়া যায় ফেইসবুকের স্ট্যাটাসে ততোটা পাওয়া যায় না আনন্দের খবর। খুশির খবর। যায় না কেননা ফেইসবুকও এই যুগযন্ত্রণার বাইরের কিছু নয়। নিও লিবারাল বাস্তবতায় বাজারি লেনদেন আর বেচাকেনার যুগে আমরা কেউ যে ভালো নেই। একটুও ভালো নেই। ভালো নেই বলে ফেইসবুকও ভালো নেই। এই একাকীত্ব ঘোচাতে অনেক অনেক তরুণ তরুণী রাতভর বসে থাকে ফেইসবুকে। কী যেন খোঁজে। কী যেন খোঁজে। আসলে একাকীত্ব ঘোচানোর উপায় খোঁজে। যন্ত্রণা ভুলে থাকবার রাস্তা খোঁজে। কিন্তু শেষাবধি খুঁজে পায় না। পায় না বলেই পরদিনও ফেইসবুকে একই সেই যন্ত্রণা আর একাকীত্বের খোঁজ পাওয়া যায়। যুগের যন্ত্রণা আর যুগের একাকীত্ব। এভাবে রাতের পর রাত কেটে যায়, নতুন সকাল আসে, কিন্তু একাকীত্ব আর যন্ত্রণা ঘোচে না।

যন্ত্রযুগে যান্ত্রিক মানুষ: মোবাইল ফোন/ল্যাটপট/নোটপ্যাডের সাথে ফেইসবুকে বসবাস

খুব কাছের বন্ধুদেরও দেখি, যেন ঐ একাকীত্ব ঘোচাতেই এই যন্ত্রযুগে মানুষও হয়ে ওঠে চলমান যন্ত্র। দেখেছি নিজেরই অভিজ্ঞতায়, যে বন্ধুটি আমার সাথে হাঁটছে, কিংবা বসে আছে সে আসলে আমার সাথে নেই। ফেইসবুকে আছে, মোবাইল ফোন দিয়ে। একাকীত্ব ভোলার চেষ্টায় আছে। কিংবা অন্যকোথাও, অন্যকিছুতে। এইযুগে মানুষ ক্রমশ চলমান যন্ত্র হয়ে উঠছে। ফেইসবুক এই যন্ত্রমানবের আদল স্পষ্ট করছে। সুমনের গানের সেই সময়, শিকার যেখানে বসে থাকে শিকারীর খোঁজে সেই যুগ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

সম্পর্কের নেটওয়ার্ক: কখনও সামাজিক সংগঠন কখনওবা আবার বাজারি লেনদেন আর স্বার্থের নেটওয়ার্ক

ফেইসবুককে বলা যায় সম্পর্কের নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক কখনও বন্ধুতার, কখনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী লোলুপতার কখনও ঐ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষ-লিপ্সারও। তবে বেশিরভাগ সময়ই সম্পর্কের নেটওয়ার্কটা বাজারের ছক মেপে চলে। যার বাসনা কবি হবার, কবিরাই তার বন্ধু; যার বাসনা নায়িকা হবার, পরিচালকরা তার বন্ধু; যার বাসনা মডেল হবার, নির্মাতারা তার বন্ধু। মানুষ কেমন সেটা বিবেচনা নয়। কেউ ফটোগ্রাফি করতে চায়, কেউ সিনেমা বানাতে চায়, কেউ লেখক হতে চায় আবার মডেলও হতে চায়। কেউবা আবার বুদ্ধিজীবীও হতে চায়, কেউ আবার একসাথে অনেককিছুই হতে চায়। কে কেমন মানুষ সেই বিবেচনার উর্ধ্বে থাকে কে কতোটা প্রতিষ্ঠিত, কে কতোটা তারকাখচিত। আর এজন্যই আনু মুহম্মদের মতো সৎ বুদ্ধিজীবীর তালিকায় পাওয়া যায় মডেল হবার প্রত্যাশা জারি রাখা কোনো মেয়েকে। কারণ যুগটা তারকার। স্টারইজমের। নায়কত্বের। মানে পুঁজির যুগ মানুষকে তারকা বানিয়ে বিক্রি করে, ফেইসবুক সেই দোকানদারির একটা জায়গা হয়ে দাঁড়ায়।

ভাষাগত আধিপত্য: উপনিবেশিত আমি আর ইংরেজী-ঢাকাইয়া আধিপত্য

ভাষাকে ক্ষমতা হিসেবে চিনতে শিখিয়েছেন এই যুগের চিন্তাবিদরা। ভাষার একটা রাজনীতি আছে এটা এখন আমরা সবাই কমবেশি জানি। ফেইসবুক সেই ভাষার রাজনীতির বাইরে অবস্থান করতে পারে না সঙ্গত কারণেই।। ভাষার দাপুটে আধিপত্য দৃশ্যায়িত হয়। আমাদের পরিসরে তার দুই রকমের চেহারা দৃশ্যমান হয়। কেউ কেউ নিজের ইংরেজী জ্ঞান যতোটা আছে তার সবটা জাহির করতে চেষ্টা করে ফেইসবুকের মধ্যে। স্ট্যাটাসে, কমেন্টে ঝরে ঝরে পড়ে ইংরেজী জ্ঞান। ঝরে পড়ে উপনিবেশিক দাসত্বের ভয়ঙ্কর বাস্তবতার সংস্কৃতি। আবার কখনও কখনও আধিপত্যের হাতিয়ার হয়ে হাজির হয় ঢাকাইয়া ভাষা। আমি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিপক্ষে নই বরং সেটাকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কিন্তু রাজধানী ঢাকার ভাষা যখন কেউ আওড়াতে থাকে যে কিনা ঐ ভাষায় অভ্যস্ত নয়, তখন টের পাই আধিপত্যের কবলে পড়েছে সে। সেন্ট্রালিজমের আধিপত্যে বিকৃত হতে থাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক।

মধ্যবিত্ত বৈপরীত্য : সবকিছু মিলে মিশে একাকার!

ফেইসবুক প্রদর্শন করে মধ্যবিত্তের বৈপরীত্য। আমি এই বৈপরীত্যকে আমাদের বাস্তব জগতের পরিসরে মধ্যবিত্তের বৈপরীত্য হিসেবেই পাঠ করতে পারি। পাঠ করি। ধর্মীয় অবস্থান হিসেবে যিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন নাস্তিক্যের সেই তিনিই আবার অংশ নিচ্ছেন ভাগ্য গণনার কুইজে। আবার ঐ ধর্মীয় অবস্থান হিসেবে যিনি ইসলামের কথা বলে রেখেছেন তাকে রাজনৈতিক বিশ্বাসে আবার দেখছি মুক্তিমুখীন সমাজতন্ত্রী

হিসেবে। নারীবাদী হিসেবে যার দেখা মিলছে, দেখা মিলছে নৃতত্ত্বের তরুণ গবেষক হিসেবে সেই তাকে দেখছি ফেইসবুক সরবরাহকৃত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে, সৌন্দর্যের একক-একমুখী-বৈচিত্রহীন-পিতৃতান্ত্রিক-বর্ণবাদী নির্মাণের মাঝে নিজেকে সঁপে দিতে। যে এবাউট মি অপশনে নিজের সম্পর্কে লিখে রেখেছে স্বাধীনতাই তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সেই আবার রাজনৈতিক অবস্থান হিসেবে লিখে রেখেছে এমন কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি অঙ্গীকারের কথা যে দলটি চরম কর্তৃত্বেরই চর্চা করে। এমনি করে কবিতায় বলছেন এক কথা, স্ট্যাটাসে বলছেন আরেক কথা, মন্তব্য করছেন একরকম, নিজের সম্পর্কে লিখে রেখেছেন আরেক রকম– এমন বৈপরীত্যে ফেইসবুক ভরপুর। এই বৈপরীত্য এই যুগেরই বৈপরীত্য। বাজারি লেনদেন আর স্বার্থের যুগের এক স্বাভাবিক-সাধারণ প্রক্রিয়া। আমি নিজেও কি কখনওই এই বৈপরীত্যের মাঝে আত্মসমর্পণ করিনি! এমনটাও মনে করি না। কেননা আমিও এই যুগেরই মানুষ!

প্রদর্শনের রাজনীতি: দেখনদারির যুগে দেখনদারীর দোকানদারী
ফেইসবুকের নারী এবং কামুক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক-ফটোগ্রাফার-এ্যাকটিভিস্টরা।

কেনা-বেচার এই ঐতিহাসিক যুগপর্বে আমরা সবাই বেশ্যা। কেউ শারীরিক শ্রম বেচি, কেউ প্রবন্ধ বেচি, কেউ গান বেচি, কেউ বিক্রি করি প্রতিরোধ। কেউবা আবার গতর বিক্রি করে। বিক্রি করে শরীর। আর এই পুরুষতান্ত্রিক পুঁজির যুগ, নিতান্তই বাধ্য হয়ে শরীর বিক্রি করা মেয়েদের বেশ্যা হিসেবে এককভাবে নির্মাণ করে। আড়াল করে বেশ্যা-যুগের অন্যান্য বেশ্যামো। ফেইসবুকও সেই বেশ্যাবৃত্তির এবং বেশ্যাবৃত্তি আড়ালের একটা পরিসর। এখানেও হরদম দর হাকানো হয়, জারি রাখা হয় প্রদর্শনের রাজনীতি। ফটোগ্রাফার ছবি প্রদর্শন করে, প্রাবন্ধিক প্রবন্ধ প্রদর্শন করে, কবি প্রদর্শন করে কবিতা। আর একমুখী সৌন্দর্যের যুগে 'সুন্দরী'রা প্রদর্শন করে সুন্দর সুন্দর ছবি। প্রাবন্ধিক প্রবন্ধ প্রদর্শন করে বাহবা কুড়োয়, কবি কবিতা প্রদর্শন করে বাহবা কুড়োয়, 'সুন্দরী'রা ছবি প্রদর্শন করে প্রশংসা কুড়োয়। বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-মডেল-মডেল হবার প্রত্যাশী-সেক্স-প্রতিরোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যে কবি নিজেকে বন্ধুত্বের আহ্বান পাঠাবার সুযোগ থেকে অন্যদের বঞ্চিত করে রেখেছে সেই কবিকেই দেখি বিভিন্ন 'সুন্দরী' নারীদের ওয়ালে গিয়ে ছবি পোস্ট করে আসছে। কেউ কেউ নোট লিখে এমনভাবে শুধুই মেয়েদের ট্যাগ করে রাখে যেন ফেইসবুকের সমস্ত ছেলেরা অক্ষর-বঞ্চিত। বুদ্ধিজীবী হিসেবে সুখ্যাত-স্বল্পখ্যাত অনেককে দেখি, যার সঙ্গে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ করবার সুযোগ পাওয়া যায় না, সেই বুদ্ধিজীবীই হিন্দী সিনেমার গল্প করে যায় নিরন্তর, কোনো সুন্দরী মেয়েকে পেলে। বিপরীতে স্টার-সুখ্যাত-স্পল্পখ্যাত পুরুষদের প্রতি মেয়েদের একইরকম পুরুষতান্ত্রিক আগ্রহও পাওয়া যায়। অনেক তারকাখচিত বুদ্ধিজীবী-বিবৃতিজীবী কিংবা বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-লেখক হয়ে উঠবার প্রচেষ্টারত পুরুষ তাদের ইন্টারেস্ট হিসেবে শুধুই মেয়েদের কথা জানান দিয়ে রেখেছে প্রফাইল ইনফরমেশনে। যেন নারী জীবনের রহস্য উন্মোচন করলেই গোটা দুনিয়াটাকে

জানা যাবে। পুরুষের কোনো রহস্য নেই। তাকে বুঝবারও প্রয়োজন নেই। ফেইসবুককে তাই আমাদের সমাজের মতোই পিতৃতান্ত্রিক-পুঁজিপ্রেষিত দেখনদারির, দোকানদারীর একটা পরিসর হিসেবে চিনে নিতে হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

ঐ সুদূর প্রবাস থেকে ভেসে আসে দেশ-বিষাদের ছন্দ

এতোক্ষণ যা যা বললাম, ফেইসবুক শুধু তাই নয়। আরও অনেক কিছু। কে যেন সুদূর কানাডায় বসে বিষাদ সৌন্দর্য্যের কাব্য রচে যায় আর ভোরবেলায় তার পুনঃ পুনঃ পাঠপর্ব শেষ করে সুন্দরে আবগাহন করি। ফেইসবুকের মেসেজ হয়ে ভেসে আসে প্রতিরোধের খবর। প্রবাসে থাকা প্রতিরোধীরা শুনিয়ে যান আমাদের অর্জনের গল্প, তাদের প্রচেষ্টার গল্প। দেশে এশিয়া এ্যানার্জির অন্যায্যতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জারি রেখে কীভাবে তারা বৃটিশ পার্লামেন্ট-বৃটিশ আইনজীবীদের মাধ্যমে এটাকে একটা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করতে সক্ষম হলেন সেই গল্প। আর কে যেন মেসেজে মেসেজে ভার্তৃত্ব ছড়িয়ে দিয়ে সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা পাঠায়। রেমিট্যান্স বাড়ায় আর চায়, ভালো থাক দেশ (এই দেশ মানে কিন্তু রাষ্ট্র নয়, এই দেশ মানে মাটি আর মানুষ), ভালো থাক মা-মাটি-মমতা।

মুক্ত-সৃজনের মুক্ত পরিসর

কবিতা বলি, গান বলি, ছবি বলি, ফটোগ্রাফি বলি যেকোনো সৃষ্টিকর্মের কথাই বলি না কেন, ফেইসবুক হলো সৃজনের এক মুক্ত পরিসর। কোনো মডারেশন নেই, সম্পাদনার কর্তৃত্ব নেই, বাজারের হিসেব নেই, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব সৃজনকর্মকে উপস্থাপন করতে পারেন অনায়াসে। তাই একদিকে ফেইসবুককে যখন প্রদর্শনীর পরিসর বলেছি, তখন এটা না বলাটা খুব অন্যায্য হবে যে, একইসাথে ফেইসবুক মুক্ত সৃজনের এমন এক পরিসর যেখানে আমরা সবাই রাজা। যা খুশি তাই লেখা যায়, যা খুশি তাই আঁকা যায়, যেমন ছবি খুশি তেমন ছবিই তোলা যায়, যেমন গান খুশি তেমন গান গেয়ে আপলোড করা যায়, ফেইসবুক যেন আমাদের কর্তৃত্বশীল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতের বিরুদ্ধে এক চলমান জেহাদ। আর তাই কোথাও কোথাও ভেঙে যায় সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পের প্রবাহমান ডিসকোর্স। নারীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ফেইসবুক বেয়ে কবিতার নাম করে, প্রকৃতির অপরূপ রহস্য টের পাইয়ে দেয় কার যেন তোলা ছবি, কে যেন এঁকে চলে রঙে-বেরঙে বিবর্ণ সময়... আধিপত্যশীল অক্ষর সভ্যতার মাঝে অক্ষর-মোকাবিলা হয় অক্ষরে অক্ষরে...

বন্ধুতা বৈরীতা ঐক্য আর ভেদ

বন্ধুতা বৈরীতা ঐক্য বিভেদ নিয়েই ফেইসবুকে আছে অনেক অনেক অনেক মানুষ। বাহাস চালিয়ে যাবার এক অনন্য মাধ্যম এই ফেইসবুক। চ্যাট করে কিংবা মেসেজে কিংবা কমেন্টে বাহাসের সংস্কৃতি সত্যিই গণতান্ত্রিকতার বোধকে শাণিত করে। (যদিও এই বাহাসে অনেকেই রাজি না এখনও, তবু এই বোধ শাণিত হচ্ছে বলেই মনে হয়।)

স্পষ্ট হতে থাকে ঐক্য আর বিভেদের চিহ্নগুলো। আর এরই মাঝ দিয়ে বন্ধুতা তৈরি হয়, বৈরীতা তৈরি হয়। কতোটুকু মিললে ঠিক কতোটা বন্ধু হওয়া যায় তা বিবেচনার জন্য অনেক অনেক রাস্তা খোলা রেখেছে এই ফেইসবুক। প্রোফাইলে দেয়া ইনফরমেশন, স্ট্যাটাসে বলা নিজের অনুভূতি, আর নিত্যদিনের ফেইসবুক তৎপরতাই নির্ধারণ করে দেয় কার সাথে তার কতোটুকু কি লেনদেন হবে। আর তাই ফেইসবুক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র হিসেবে নিজের বিশিষ্টতা জারি রাখতে পারে। এখানে ঐক্য ঘটে প্রতিরোধীদের, কখনও নিছক গল্পকারীদের, কখনও কবি-সাহিত্যিকদের, কখনও কামুক পুরুষ-নারীদের। যার যার পরিসরে যার যার কাজ সে সে করে যায় তার তার মতো। এই যা খুশি করবার গণতান্ত্রিক অধিকার ভার্চুয়াল জগতকে ছাপিয়ে আমাদের চেনা-জানা বাস্তবেও অনুশীলনের সম্ভাবনা তৈরি হয়, সম্ভাবনা তৈরি হয় ঐ ভার্চুয়াল জগতের ফেইসবুকেই।

প্রতিরোধের মুক্ত জমিনঃ বিশ্বায়িত পৃথিবীর স্বপ্ন-সম্ভাবনা

তাই যে ফেইসবুক বাজারের যুগের টুলস সেই ফেইসবুকই আবার প্রতিরোধের মুক্ত জমিন। শুরুতেই বলে নিয়েছি যে কেবল মধ্যবিত্ত পরিসরে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ, তবুও প্রতিরোধ তৈরিতে এই ফেইসবুক-এর মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোই উন্মোচন করেছে প্রতিরোধের নতুন দিগন্ত। বিশ্বব্যাপী মুক্তিকামী প্রতিরোধ আন্দোলনের স্বাধীন কর্মীরা এই ফেইসবুক ব্যবহার করে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে সত্যিকারের বিশ্বায়িত পৃথিবীর স্বপ্ন-সম্ভাবনা। কজ-ইভেন্ট-গ্রুপ-পিটিশন ব্যবহার করে দুনিয়াব্যাপি মানবাধিকার হরণ, অন্যায্য বাণিজ্য চুক্তি, যুদ্ধবাজ অর্থনীতি, অমানবিকতা, অসাম্য, অন্যায্যতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জারি রেখেছে দুনিয়ার অনেক অনেক মুক্তিকামী মানুষ। ফেইসবুক হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের এক অনন্য হাতিয়ার। সেই যে উনিশ শতকে মার্কস দুনিয়ার সমস্ত মজদুরের এক হবার স্বপ্ন হাজির করেছিলেন কমিউনিস্ট ইশতেহারে, আজ ভিন্ন পরিসরে সেই বাসনা পূরণ হতে চলেছে দুনিয়ার সমস্ত প্রতিরোধকামী মানুষের ঐক্যের সম্ভাবনার মাঝ দিয়ে। প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মী, বন্ধুজন, প্রিয়ভাজন নোম চমস্কির মাধ্যমে জেনেছিলাম, ১৮ শতকে শ্রমিকদের প্রেসকে ধ্বংস করা হয়েছিলো ছাপা আর কাগজের দাম বাড়িয়ে। ইন্টারনেট সেই জায়গায় বয়ে নিয়ে এসেছে অভূতপূর্ব প্রাযুক্তিক কল্যাণ। হুম, প্রাযুক্তিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই একে বড়লোকের মাধ্যম করে রাখা যাচ্ছে না। গড়ে উঠছে সামজিক যোগাযোগের নেটওয়ার্ক, গড়ে উঠছে বিজ্ঞাপন আর বাণিজ্যের স্বার্থে, কিন্তু প্রতিরোধকামী মানুষ তাকে ব্যবহার করছে অন্য কাজে। প্রতিরোধের কাজে। বন্ধুতার কাজে। লেনদেনের বাইরে অন্য হিসেবের কাজে। দুনিয়াকে সুন্দর করবার কাজে। এখানেই আমাদের আশা। এখানেই আমাদের ভরসা। আর একেবারে সমাজের নিচুতলায় এই সামাজিক যোগযোগের মাধ্যমকে পৌছে দেবার অঙ্গীকারও এখানেই। যেখান থেকে উত্থিত হয় মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন। এই ফেইসবুকে, কে জানি খুব নিভৃতে রাতভর আঁকতে থাকে

ভালোবাসার রংধনু। কেউ খুব লুকিয়ে দেখতে থাকে কেমন আছে প্রিয়তম মানুষটি যার সাথে আর সংযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। কেউ খুব যত্নে দেখতে থাকে নীরবে, কেমন আছে বাস্তব জগতের বন্ধুটি, অভিমানে যার সাথে অনেক দিন যোগাযোগ নেই, কিন্তু ভার্চুয়াল পরিসরে যোগাযোগটা ঠিকই আছে। কেউ খুব হঠাৎ প্রচণ্ড কষ্টভারাক্রান্ত হয়ে একটি গান লিখে দেয় স্ট্যাটাসের ঘরে। কেউ লিখে দেয় প্রতিরোধের নোট। প্রতিরোধের স্ট্যাটাস। না মানার দৃপ্ত প্রত্যয়। ভালোবাসা আর প্রতিরোধ বাসনা নিয়ে এরা সবাই আধুনিক যুগের যন্ত্রণাসম্পন্ন মানুষ। বিশ্বায়নের যুগে এই ফেইসবুক-এর মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম দিয়ে যারা প্রতিশ্রুতি আর স্বপ্ন চালাচালি করে যাচ্ছে, বেদনা আর হাহাকার চালাচালি করে যাচ্ছে। এইসবমিলে, নিজেদের পরিসরে আমরা যদি চিনে নিতে পারি ফেইসবুককে, ভার্চুয়াল বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে, যন্ত্রমানব না হয়ে, ফেইসবুক-পুরুষ/ফেইসবুক-নারী না হয়ে, মানে আমরা যদি সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমটির শিকারে পরিণত না হয়ে তাকে ব্যবহার করতে পারি যার যার জায়গা থেকে বুঝে নিয়ে, তাহলে বিশ্বায়িত পৃথিবীর স্বপ্ন-সম্ভাবনা সত্যিই এগিয়ে যাবে ফেইসবুকের হাত ধরে। ফেইসবুকের মতো অন্যান্য সামাজিক যোগযোগের মাধ্যমের হাত ধরে। সেখানেই আমাদের আশা।

শেষের পরেঃ নজরদারি, বিজ্ঞাপন, বিপনন, গোয়েন্দা তৎপরতা ইত্যকার প্রসঙ্গ

ফেইসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে ক্রমাগত, বেড়েছে মাইস্পেস ও টুইটার ব্যবহারকারীর সংখ্যাও। বেনিয়ারা নাচছে, লাফাচ্ছে আনন্দে। অনলাইন শিল্প সবসময় নতুন প্রবণতা খোঁজে; তারা চটজলদি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো আত্মস্থ করে নিয়েছে। ইউটিউবের মতো সাইটও ব্যক্তিগত জীবনকথা (পারসোনাল প্রোফাইলিং) যোগ করেছে। এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের সাইটগুলো মানুষে-মানুষে ঐক্যের সুপ্ত বাসনা অথবা বন্ধুসুলভ দেখা-সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আর তারই বিপরীতে একটু একটু করে বাড়ে নজরদারি। এই নজরদারি মানুষের প্রতিরোধ বাসনা দমনের জন্য কখনও গোয়েন্দা নজরদারি, আবার কখনও বহুজাতিক বেনিয়াদের পণ্য বিকোবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নজরদারি।

সুইডেনের কার্লস্টাড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণমাধ্যম ও যোগাযোগ অধ্যয়নের শিক্ষক ড. মিয়াস ক্রিস্টেনসেন তথ্য দিচ্ছেন (৩ ডিসেম্বর, *পরের হাতে কলকাঠি* শিরোনামে তাঁর লেখাটির ভাষান্তর ছাপা হয়, সেখান থেকে উদ্ধৃত করছি):

> ফেইসবুকে বাণিজ্যিক নজরদারির প্রকৃত ব্যাপ্তি এখনো ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। গোপনীয়তাবিধি অনুযায়ী, সদস্যদের সম্পর্কিত তথ্য সংবাদপত্র, তাৎক্ষণিক বার্তা প্রেরণ সেবাদাতা ও বণ্টনের মতো উৎস থেকে সংগ্রহ করার অধিকার ফেইসবুকের আছে। ফেইসবুক ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনি সম্মতি জানান যে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো অথবা প্রক্রিয়াজাত করা যাবে। কখন, কীভাবে এসব উপাত্ত ব্যবহার করা হবে তা ব্যবহারকারীকে অবহিত করা হয় না।

কানাডিয়ান ইন্টারনেট পলিসি অ্যান্ড পাবলিক ইন্টারেস্ট ক্লিনিক ২০০৮ সালে ফেইসবুকের বিরুদ্ধে কানাডার গোপনীয়তা আইন ২২ বার লঙ্ঘনের অভিযোগ করে। কানাডায় ফেইসবুক ব্যবহারকারীদের অনেকের বয়স ১৪ থেকে ২৫ বছর। এ গোষ্ঠী তাদের নাজুকতার বিষয়টিও উত্থাপন করে। অধিকাংশ ব্যবহারকারী ফেইসবুকের ডিফল্ট সেটিং মেনে নেয়, গোপনীয়তা ও উপাত্ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এগুলো কী অর্থ বহন করে তা বিবেচনা না করেই। যেহেতু সম্মতির ভিত্তিতে ফেইসবুকে ব্যবহারকারীর উপাত্ত অন্যের সঙ্গে ভাগ করা হয়, ফলে এমন উদ্বেগের ন্যায্যতা ফেইসবুক অস্বীকার করে। কিন্তু কেউ যদি কঠোরতম প্রাইভেসি সেটিংও বেছে নেয়, তারপরও তার উপাত্ত ব্যাপক হারে অন্যের সঙ্গে ভাগ হওয়ার সুযোগ থেকেই যায়, যদি তার বন্ধুদের প্রাইভেসি সেটিংস নমনীয় হয়। এক জরিপ থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫ শতাংশ চাকরিদাতা সম্ভাব্য চাকুরেদের জীবনকথা জানতে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের শরণাপন্ন হওয়ার কথা স্বীকার করেন। প্রকৃত সংখ্যা হয়তো আরো বেশি।

ইলেকট্রনিক প্রাইভেসি ইনফরমেশন সেন্টার (ইপিআইসি) এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশনে ফেইসবুকের হালনাগাদ লাইসেন্সের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করার ঘোষণা দিয়েছিল। বণ্টনের ও ভোক্তা অধিকার গোষ্ঠীর সঙ্গে ৪০ হাজারের বেশি ফেইসবুক ব্যবহারকারী মিলে ব্যবহারবিধিতে একটি পরিবর্তনের প্রতিবাদ জানায় বলে কিন্তু এই নজরদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও খবর দিয়েছেন ঐ ড. মিয়াস ক্রিস্টেনসেন। তাই ফেইসবুকের মধ্যে এই শক্তি আছে যা আমাদের অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জারি করবার উপায় থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি। প্রতিরোধের পরিসরই তৈরি করেছে সে। যদি আমরা তা চাই। যার যার চাওয়াগুলো নিয়ে, তর্ক-বিতর্ক আর ঐক্য-বিভেদের সূত্রগুলো নিয়ে মানুষ এগিয়ে যাবে ফেইসবুককে সাথে নিয়েই। তাকে এড়িয়ে নয়। যতোদিন অন্য কোনো আরও নিবিড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তৈরি হয়ে যায়। কেননা সমাজ গড়বার বাসনা মানুষের চিরন্তন বাসনাই বটে! হোক না সেটা ভার্চুয়ালি!

বাজারের যুগে মিডিয়া; ২০১১

GRONTHO.COM

*প্রথম আলো*তে প্রকাশিত পিৎজা হাটের বৈশাখী বিজ্ঞাপন: পণ্যযুগে মানবীয় সম্পর্কের পাঠ

> ...প্রথমত বলা যায়, শ্রম শ্রমিকের কাছে বাইরের জিনিস; তার মানে শ্রম তার স্বভাবগত কোনো আচরণ থাকে না। কাজের মধ্যে তাই শ্রমিক নিজেকে স্বীকৃতির বদলে অস্বীকৃতিই জানায়, তৃপ্তির বদলে অতৃপ্তি বোধ করে, দৈহিক ও মানসিক শক্তির সুষ্ঠু ও স্বাধীন বিকাশ তো দূরের কথা, দেহ মনকে তিলে তিলে ধ্বংস করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। শ্রমিক তাই নিজেকে তার কাজের বাইরে বলে অনুভব করে; আবার কাজের ক্ষেত্রে কাজটাকে অনুভব করে নিজের বাইরে বলে। যতক্ষণ সে কাজ করে না ততক্ষণ সে স্বস্তিবোধ করে; আর যখন সে কাজ করে তখন সে স্বস্তি হারায়। তাই তার শ্রম স্বেচ্ছাকৃত নয়, বরং জবরদস্তিমূলক। এই শ্রম তাই কোনো অভাবের তৃপ্তিসাধন নয়; বরং নিছক তার বাইরের কোনো অভাব মেটাবার উপায় মাত্র। শ্রমের এই বিচ্ছিন্ন চরিত্রের প্রকাশ ঘটে যখন দেখা যায় যে, কোনো রকম বাস্তব চাপ প্রয়োগ না করলে শ্রমের প্রবাহে ভাটা পড়ে। বাহ্যিক শ্রম- (যে শ্রমে মানুষ নিজেকে বিজাতীয় করে ফেলে) শ্রমিকের একধরনের আত্মউৎসর্গ, শ্রমের পচনশীলতা। সবশেষে শ্রমের এই বাহ্যিক চরিত্র শ্রমিকদের জন্য এটাই প্রতীয়মান হয় যে এটি তার নিজের নয়, অন্য কারো। এ শ্রম তার দখলে নয়, বরং সে নিজেই শ্রমের দখলে; সে শ্রম নিজের জন্য নয়- অন্য কারো জন্য। [http://www.marxists.org/bangla/archive/marxengels/1844/epm/epm_seg1.htm]

১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপিতে মার্ক্স পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিধ্বংসী রূপটির সম্পর্কে এভাবেই আলাপ তুলেছেন। মানুষের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া কী করে মানুষ প্রথমত শ্রম প্রক্রিয়া থেকে, দ্বিতীয়ত সৃষ্ট বস্তু থেকে, তৃতীয়ত নিজের মানবিক স্বরূপ হতে, চতুর্থত অপর মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে মানুষকে। মার্ক্সের মতামত হচ্ছে যে, বিচ্ছিন্ন শ্রম তার প্রজাতিসত্তা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। অর্থাৎ যে গুণগুলি কেবল মনুষ্যজনোচিত সেগুলো পুঁজির সংস্পর্শে ভিন্ন আকার ধারণ করে। মানে মানুষের মাঝে সহজাতভাবে জারি থাকা সহযোগিতা-সহমর্মিতা-ভালোবাসার বোধ পুঁজির সংস্পর্শে ভিন্ন আকার ধারণ করে। মার্ক্সের ভাষায় এইযুগে:

> কোনো ভীতুর ডিমও যদি সাহস কিনতে পারে তবে সেই সাহসী। অর্থ কোনো বিশেষ গুণ, কোনো একটি বিশেষ জিনিসের জন্য অথবা কোনো বিশেষ মানবিক ক্ষমতার জন্য বিনিময়িত হয় না, বরং এর বদলে মানুষ এবং প্রকৃতির তাবৎ জগত পাওয়া যায়। তাই অর্থের মালিকের অবস্থান হতে অর্থ যে কোনো গুণাবলীর বিনিময়ের কাজ করতে পারে, তা পরস্পরবিরোধী হলেও অসুবিধে নেই। অর্থ হল অসম্ভবগুলোর ভাই ভাই হয়ে যাওয়া, এর হাতে পরস্পরবিরোধিতাও গলাগলি করে।[http://www.marxists.org/bangla/archive/marxengels/1844/epm/epm_seg3c.htm]

তারমানে মার্ক্স সেই কবেই বলে গিয়েছিলেন, এইযুগে টাকা দিয়েই সবকিছু মাপা হবে। টাকা দিয়েই মানুষ আর প্রকৃতির তাবৎ জগত পাওয়া যাবে। তারমানে টাকা দিয়ে ভালোবাসাও কেনাবেচা করা যাবে। এভাবেই পণ্যযুগ বিচ্ছিন্ন মানুষের মানবীয় সম্পর্ককে পণ্যসম্পর্কে রূপান্তরিত করতে চায়। অর্থ দিয়ে সব পাওয়া যায়। বাজারের যুগে মার্ক্স কতখানি প্রাসঙ্গিক এখনও সেটা বুঝতে পারি বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব পাঠ করলে। আর মানবিক স্বরূপ হারিয়ে নিজের থেকে আর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানুষ দাসত্বের জীবনযাপন করে; পুঁজি আর ক্ষমতার দাসত্ব।

পণ্যমোহাচ্ছন্নতার এই বাজারের যুগ মানুষের আরসব পরিচয় মুছে দিয়ে তাকে স্রেফ ক্রেতা-বিক্রেতায় পর্যবসিত করতে চায়। যাবতীয় সম্পর্ক রূপ নেয় পণ্য-সম্পর্কে। আর তাই আজকের যুগে আছে জীবনবীমা; মানে মৃত মানুষের জীবনের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া। আছে সাহায্য। রাষ্ট্র-কর্পোরেশন-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মানুষ মরে গেলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়, জীবনের দাম দেয় টাকা দিয়ে। টাকার অঙ্কে জীবনের দাম মাপে। অসুস্থ মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন, মানে জীবনের প্রশ্নও একইভাবে স্রেফ টাকার প্রশ্ন। টাকা থাকলে চিকিৎসা হবে, না-থাকলে নাই... আর ভালোবাসা? তার কি হাল। হাল সবিশেষ ভালো কিছু না। ঐ একই। এই লেখায় পণ্যযুগে সেই ভালোবাসার সম্পর্ককেই পাঠ করতে চেয়েছি একটি বিজ্ঞাপনকে ঘিরে।

মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতার ধারণা মাথায় রেখেই দেখছিলাম একটি বিজ্ঞাপন। বৈশাখী খাবারের বিজ্ঞাপন; *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত পিৎজা হাটের বিজ্ঞাপনটির বিশ্লেষণের শুরুতে আমি পিৎজা হাটের হয়ে ওঠার ইতিহাসটা বর্ণনা করব সংক্ষেপে। পিৎজা হাটের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত ইতিহাস থেকে যা জানা যাচ্ছে সেখান থেকে বলি:

১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসে ফ্রাঙ্ক এবং ড্যান ক্যারনি মাত্র ৬০০ ডলার পুঁজি বিনিয়োগ করে পিৎজার যে ব্যবসা শুরু করেছিল বর্তমানে সেই পিৎজা হাট বৈশ্বিক পুঁজির একটা অংশ হিসেবে বিশ্বের অন্যতম আন্তর্জাতিক ফুড চেইনে পরিণত হয়েছে। ২৫ আসনবিশিষ্ট রেস্তোরাটি দেখতে ছোট্ট কুঁড়েঘরের মত ছিল বলে এর নামকরণ করা হয়েছিল পিৎজা হাট। ১৯৭২ সালে পিৎজা হাটের ব্যবসা আরো সম্প্রসারিত হয় আর এসময় যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ১০০০টি রেস্টুরেন্ট চালু ছিল। যাত্রা শুরুর মাত্র পনের বছরের মাথায় ১৯৭৩-এ যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং জাপানে রেস্টুরেন্ট খোলার মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করে পিৎজা হাট। ১৯৭৭ সালে এসে বাজার আরো বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে মালিকানায় পরিবর্তন আসে। বিশ্বের অন্যতম কোমলপানীয় প্রতিষ্ঠান পেপসিকো পিৎজা হাট কিনে নেয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সাল থেকে পেপসিকো ও যুক্তরাজ্যের হুইটব্রেডের যৌথমালিকানায় পিৎজা হাট আরো বিস্তৃত হতে থাকে। ১৯৮৭ সালে দেখা গেছে যুক্তরাজ্যে গড়ে প্রতিসপ্তাহে পিৎজা হাটের একটি রেস্টুরেন্ট চালু হয়েছে। ৯৭ সালে এসে পেপসিকো কোমলপানীয় ব্যবসায় মনোযোগী হওয়ার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্ট ব্র্যান্ড হিসেবে ট্রাইকন গ্লোবাল রেস্টুরেন্ট চালু হয়।

পরবর্তীতে ২০০২ সালে ট্রাইকন গ্লোবাল নাম পরিবর্তন করে ইয়াম ব্র্যান্ড নামকরণ করা হয়। ২০০৬ এ হুইটব্রেড যৌথ শেয়ারের তাদের অংশটুকু ইয়াম ব্র্যান্ডের কাছে বিক্রি করে দিলে পিৎজা হাটের শতভাগ মালিকানা চলে যায় ইয়ামের কাছে। অর্থাৎ পুঁজি স্ফীত হতে হতে সেই ছোট্ট পিৎজা হাট আর কুঁড়েঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এক বিশালায়তন ধারণ করেছে এবং বিশ্ববাজারের অংশ হয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বের ১৩২ টি দেশে প্রায় ৩৪ হাজার পিৎজা হাটের রেস্টুরেন্ট রয়েছে।

দুই ভাইয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ইউরোপ পেরিয়ে মুনাফার লোভে ছুটে এসেছে বাংলাদেশেও, মুক্তবাজারের মহাদানব হয়ে। বাংলাদেশে পিৎজা হাটের ফ্রাঞ্চাইস হচ্ছে ট্রান্সকম গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ট্রান্সকম ফুড। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পিৎজা হাটের ৪ টি শাখা রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর তিনটি শাখা ঢাকায় ও অন্যটি চট্টগ্রামে অবস্থিত।

অন্যদিকে যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছে সেই *প্রথম আলো* সংবাদপত্রটি-ও কর্পোরেট বিজনেস গ্রুপ ট্রান্সকমের মালিকানাধীন। আর বাজারের যুগে এসব কর্পোরেট বিজনেস গ্রুপের পত্রিকাগুলোর প্রধান কর্মসূচি যেহেতু 'নিজ নিজ বিজনেস গ্রুপের পুঁজি-মুনাফা-ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করা, বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যবসায়িক খাতের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করা, দেশী-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজির অনুকূল সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠন করা তথা ভোগবাদী সমাজ গঠন' সেইহেতু *প্রথম আলোর* মতো একটি কর্পোরেট-মতাদর্শিক-এলিট পত্রিকায় নিজ বিজনেস গ্রুপের পুঁজি- মুনাফার-স্বার্থ রক্ষাকারী পিৎজা হাটের বিজ্ঞাপন প্রকাশ। আমরা সবাই জানি।

বিজ্ঞাপনের ইমেজটিতে একটি এলিট বাস্তবতা উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে পহেলা বৈশাখ আর পিৎজা হাটের ফাস্টফুড মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ইমেজটিতে চোখ রেখে যে কেউ টের পেতে বাধ্য হবে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীরা যে পহেলা বৈশাখকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সব বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব বলে মাতামাতি করেন, সেই বৈশাখকে বাজারের যুগ পণ্যে পরিণত করেছে । অর্থাৎ আজকে আর আমাদের কারও অজানা নাই যে জাতিগত আত্মপরিচয়ের বৈশাখ আসলে আজকে এসে কর্পোরেট পুঁজির তোড়ে বাণিজ্যিক বৈশ্বিকতা পেয়েছে। ট্রান্সকম গ্রুপের হাত ধরে তাদের পত্রিকা আর তাদের খাদ্য-ব্যবসায়ের পার্টনারেরা বৈশাখের কর্পোরেটাইজেশন ঘটিয়েছে।

বিজ্ঞাপনটি দেখতে থাকি... আসলে দেখতে থাকি বাজারের যুগ কী করে ভালোবাসাকেও পণ্যে রূপান্তরিত করে। বৈশাখ ও ভালবাসা এখানে ব্যবসায়িক স্বার্থে বাজারের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। বাজারের যুগে ভালবাসাকে মাপা হচ্ছে টাকার পরিমাণ দিয়ে। ইমেজে দেখা যাচ্ছে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে পিৎজা হাট লাভ মিল চালু করেছে। যেটাকে আমরা ভদ্রলোকের ভাষায় বিজ্ঞাপন নামে ডাকি সেই পণ্যক্রয়ের উসকানি দেয়াটার জন্য প্রচারণা জারির ব্যবস্থাটা নতুন কিছু না।

বিজ্ঞাপনে এমনকি ভালোবাসার সহজাত মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে পুঁজি করবার ব্যাপারটাও নতুন কিছু না। কিন্তু পিৎজা হাটের এই বিজ্ঞাপন আমাদের আরও নগ্নভাবে দেখিয়ে দেয় কী করে ভালোবাসা অর্থাৎ লাভ পুজির খাদ্য অর্থাৎ মিল হয়ে যায়। হয়ে যায় *লাভ মিল*! লাভ মিলের ঐ নির্দিষ্ট খাবারের দাম যখন ১৪৭৫ টাকা ছিলো তখন *লাভ* ছিলো পেইন। আর বৈশাখ উপলক্ষ্যে ঐ খাবারে ছাড় দেওয়ায় যখন সেটা ৯৯৫ টাকা হয়েছে, তখন সেটা আর পেইন নাই। সেটা ভালোবাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ভালবাসাকে টাকার অঙ্কে মাপা হচ্ছে। কম টাকায় ফাস্টফুড কিনতে পারার সক্ষমতা তৈরি হলেই ভালবাসা আর যাতনা থাকে না, হয়ে যায় ভালবাসা; বিজ্ঞাপনের টেক্সট এমনটাই দাবি করেছে। পাঠক, টুকে রাখুন এই ঐতিহাসিক যুগ যখন কিনা মানুষের ভালোবাসাকে কর্পোরেট পুঁজি টাকার অঙ্কে মাপতে শুরু করেছে, শুরু করেছে প্রকাশ্যে!

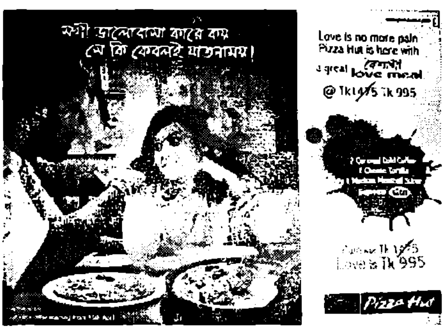

বিজ্ঞাপনের ইমেজে নারী-পুরুষ যে দুটি চরিত্র রয়েছে তাদের অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গী, উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে নারীর অর্থনৈতিক অধস্তনতার রাজনীতি নির্মিত হয়েছে। পুঁজি তো নিজেই পুরুষ। পুরুষত্বের প্রতীকও বটে! তাই পুরুষ আর পুঁজি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়! বিজ্ঞাপনে দেখতে পাই, ভালবাসা যেন একটা ফাস্ট-ফুড সংস্কৃতি যেখানে সবসময় পুরুষই পুঁজি যোগায়, অর্থনৈতিক বিষয়ে নারীর কোনো অংশগ্রহণ নেই। নারী যেন সবসময় পুরুষকে 'ভেঙ্গে খায়' যা পুরুষদের জন্য এক ধরনের যাতনা সৃষ্টি করে। এছাড়া বিজ্ঞাপনের মডেল মেয়েটার চাহনীতে মুগ্ধতা, আত্মতৃপ্তি, জীবন ধন্যভাব উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে ভালো রেস্টুরেন্টে ফাস্টফুড খাওয়ালেই যেন ভালোবাসার মানুষের সাথে ফানা হবার সুযোগ পাওয়া যাবে এরকম একটি বাস্তবতাও নির্মিত হয়েছে ইমেজটিতে। কিন্তু পুরুষ চরিষত্রটি কিন্তু পুরুষ! নির্বিচারি নন। অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে পুরুষ চরিত্রটি খেতে খেতে নারীকে কিছু বলতে উদ্যত। পুরুষ এখানে বক্তা আর নারী সেখানে শ্রোতা। এখনে পুরুষ চরিত্রটি এ্যাক্টিভ এবং নারী চরিত্রটি প্যাসিভ। অর্থাৎ পুরুষ এখানে দ্রষ্টা আর নারী দ্রষ্টব্য! এভাবেই বাজারের যুগে পুঁজি আর পুরুষতন্ত্র মিলে সবার জন্য দাসত্ব জারি করে।

পাঠক, খেয়াল করে দেখেছেন কি, যে পত্রিকাটিতে অর্থাৎ যে *প্রথম আলোতে* এরকম পুরুষতান্ত্রিক একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে সেই *প্রথম আলোর* পলিসির অন্যতম একটি জায়গা হলো নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করা। কিন্তু আমাদের খেয়াল না করে উপায় থাকে না, এসিড দগ্ধ নারীর পুনর্বাসন থেকে শুরু করে দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক

কর্মসংস্থানের কাজ করে যারা, অন্তত করার কথা বলে যারা, সেই তারাই নিজ ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করতে এবং পুঁজি-প্রেষিত পণ্যসমাজকে মসৃণ করতে ঐ পুঁজিরই ঘনিষ্ঠ সহচর পুরুষতন্ত্রকে জিইয়ে রাখে। নারী-পুরুষ সম্পর্কের সামাজিক স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ না করে প্রতিনিয়ত পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শেরই প্রতিনিধিত্ব করে এই বিজ্ঞাপনের মতো আরও অনেক অনেক কনটেন্টের মধ্যে দিয়ে। নারীকে মহিলা বানিয়ে প্রাণ-এর সাথে মিলে আচার প্রতিযোগিতা করে নারী উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। নকশা পাতায় তাকে উপস্থাপন করছে পুরুষের ভোগ্য মডেল গৃহবধু যৌনতাসর্বস্ব হিসেবে। যখন গুড়োদুধ বিক্রেতাদের সহায়তা করতে হয়, তখন নারীর মাতৃত্বের সেই অনন্য পরিচয়টি আরসব পরিচয় থেকে অস্পষ্ট করে দেবার পায়তারা করছে। বিনোদন পাতায় নারীকে উপস্থাপন করছে স্রেফ শরীরসর্বস্ব সেক্সি হিসেবে। এই হলো কর্পোরেট মিডিয়ার জেন্ডার কনশাসনেস! কানা বাজারের চোটে যে কনশাসনেস আনকনসাস-মাইন্ডে চলে যায়!

বিজ্ঞাপনের ইমেজে নারী-পুরুষের পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে সেটিকে মনে হচ্ছে মডার্ন আর্ট । এর মধ্যে দিয়েও আভিজাত্যের সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞাপনের ইমেজে, টেবিলে যে খাবারগুলো পরিবেশিত হয়েছে তার সবই এলিট শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। *লাভ মিল* এর মেনুর সুপ্রিম প্যান পিজ্জা, ক্যারামেল কোল্ড কফি, চিজ টরটিলা, মিটবল সুপার এসব খাবারের নামই শোনেনি দেশের বেশিরভাগ মানুষ। দেশের অগণিত মানুষের দুইবেলা ভাত জোটেনা সেখানে পিৎজা হাটের টরটিলা দিয়ে বৈশাখ পালন আভিজাত্যই বটে। আর যারা পিৎজা হাটের খাবার কিনে খাবার সামর্থ্য রাখেনা; এমনকি ১৪৭৫ টাকার খাবারের দাম ভালবাসা ও বৈশাখী বাজারের চোটে ৯৯৫ টাকা হলেও পারে না, বস্তিতে যে মানুষটি ৯৯৫ টাকায় একমাসের বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধানে ঘর ভাড়া দেয়– তারা কি খেয়ে বৈশাখ পালন করে? সেটা পিৎজা হাটওয়ালা কিংবা *প্রথম আলো*ওয়ালা কারোরই বিবেচ্য না, বিবেচ্য ব্যবসা, বিবেচ্য বেচা-কেনা। এখানে এসেই বারবার টের পেতে হয়, আমাদের সংবাদপত্রগুলো আদতে বড়লোকের। আমাদের সংস্কৃতি আসলে বড় লোকের। আমাদের বিজ্ঞাপনগুলো আসলে বড়লোকের। সবকিছুই বড়লোকের। সবকিছুই শাসকদের।

বাদ যান না রবীন্দ্রনাথ। বিজ্ঞাপনের ইমেজে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহারের মাধ্যমে তাকেও বাজারের পণ্য বেচা-কেনার হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনের টেক্সট লেখার সময় শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের গানের কলি এবং 'বৈশাখ' শব্দটি লেখার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া বাকি সব শব্দ ইংরেজিতে লেখা হয়েছে। অথচ যে অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পিৎজা হাট ছাড় দিয়েছে সেই বৈশাখকে বাঙ্গালির আত্মপরিচয়ের দিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যেখানে পিৎজা হাটের ভোক্তা বাঙ্গালি, যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছে সেটিও বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয় তারপরও পিৎজা হাটের বিজ্ঞাপনে এই ইংরেজি ভাষার আধিক্য আমাদের এলিট-

উপনিবেশিক বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে। আলোচ্য বিজ্ঞাপন আর *প্রথম আলো* নিজে ঐ উপনিবেশের গর্ভেই তো জন্ম নিয়েছে!

সবমিলে *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত পিৎজা হাটের বিজ্ঞাপনেও তাই দেখি; ভালবাসা-পিৎজা-বৈশাখ সংস্কৃতি সবমিলে মানবীয় সম্পর্কের পণ্য-সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়ে যাবার বাস্তবতা নির্মাণ করে। মুনাফার স্বার্থে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, ভালবাসা সবকিছুই পণ্যে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ইমেজে বলা হচ্ছে লাভ ইজ নো মোর পেইন । অর্থাৎ ভালবাসার স্বরূপ নির্ধারণ করছে পিৎজা হাট। বিজ্ঞাপনে যখন পিৎজা দাম ১৪৭৫ টাকা তখন লাভ ছিলো পেইন ,আর যখন দাম কমে ৯৯৫ টাকা হলো তখন সেটা আর পেইন না হয়ে ভালবাসা হয়ে দাঁড়ালো। অর্থাৎ বৈশাখ মানেই ফাস্টফুড, ভালবাসা মানে ফাস্টফুড, ভালোবাসা মানেই নামি-দামী রেস্টুরেন্টে প্রেমিকাকে খাওয়ানো। এবং হিসেব করে দেখতে হবে; কোথায় কম টাকায় ভালোবাসা সম্পন্ন করা যায়। এই বিজ্ঞাপনও ভালোবাসাকে সীমাবদ্ধ করেছে পিৎজা হাটের মধ্যে। ভালোবাসা সাথে অর্থের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি করে ভালোবাসাকে পরিণত করেছে কেনা-বেচার উপাদানে। বিজ্ঞাপনে শুধু পিৎজা হাটে খেয়ে বৈশাখ উদযাপনের মধ্যে বৈশাখ-চেতনাটাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে বৈশাখ সংস্কৃতির প্রাধান্যশীলদের ভাষ্য উপস্থাপন করা হয়েছে বিজ্ঞাপনটিতে। *প্রথম আলো* পত্রিকাটি যে এলিট শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে সেই শ্রেণীর ডিসকোর্সই দেখা গেছে বিজ্ঞাপনটিতে। *প্রথম আলো* ও অপরাপর জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পিৎজা হাট আর বৈশাখী ভালোবাসার পণ্য তৈরি করেছে। এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে বৈশাখের ভাবনাটাকে *প্রথম আলো*-পিৎজা হাট-ট্রান্সকম গ্রুপ তথা ক্ষমতাশালীদের ডিসকোর্সের আওতায় এসেছে। যেখানে ভালবাসা মানেই আভিজাত্য আর নিছক বাহ্যিক খাওয়া, ভোগ, ভালবাসা। পণ্যযুগে এসে টাকাপয়সা আর ভালোবাসা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আর সব কিছুর মতো ভালাবাসাকেও এই বাজারের যুগ প্যাকেটজাত পণ্য আকারে বিক্রি করতে চায়। খাবারের নাম *লাভ মিল*, ভালবাসা ধারণাটার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা শব্দটিও বাজারে কেনা বেচাঁ করা হচ্ছে। অর্থাৎ বৈশাখ উদযাপন মানে ফাস্টফুড, ভালবাসা মানে ফাস্টফুড, ভালবাসা মানে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড বাইরে খেতে যাওয়া এমনই পশ্চিমা ভোগবাদী সমাজের বাস্তবতা নির্মিত হয়েছে বিজ্ঞাপনের ইমেজটিতে । অর্থাৎ বাজারের যুগে ভালবাসার পণ্যায়ন ঘটছে। তারমানে সামগ্রিক আলাপের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা পণ্যযুগের বিচ্ছিন্ন মানুষের বাস্তবতাকে পাঠ করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, মানুষের সম্পর্ককে নিছক পণ্যসম্পর্কে রূপান্তর করতে চায় এই বাজারের যুগ আর আমার আলোচ্য বিজ্ঞাপন সেই বাস্তবতারই প্রতিনিধিত্ব করেছে।

ভালোবাসা আছে টাকার বাইরেই। যেখানেই আমরা টাকাকে অস্বীকার করি সেখানেই ভালোবাসা হয়। প্রেম হয়। বন্ধুত্ব হয়। আমরা যখন অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া শুধুই

ভালোবেসে রাস্তায় হাঁটি, দুজনে ভাগ করে দুপুরের খাবার খাই সেই তারাও ভালোবাসতে পারি। ভালোবাসতে জানি। গার্মেন্টস-এর শ্রমিক মেয়েটিও ভালোবাসে কাউকে না কাউকে। হয়তো কোনো শ্রমিককেই। সেও ভালোবাসে। সেও কাঁদে। শ্রমিক পিৎজা হাটের উচ্ছিষ্টও কিনে খেতে পারে না। তো কি হয়েছে। সেখানেই ভালোবাসা আছে। পিৎজা হাটে তো দেখি হিসেব-নিকেশ আছে। ওখানে ভালোবাসা কোথায়? হিসেবের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক বিরোধাত্মক। হিসেবে লেনদেন হয়। ভালোবাসা নয়! বাজারের যুগ লেনদেন করা শেখাতে চায়। ভালোবাসতে ভুলে যেতে প্ররোচিত করে। নিম্নবর্গের কথা বাদই দিলাম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে; গরীব মানুষের সন্তানদের জন্য যেখানে আসবার সুযোগ ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়েছে শিক্ষার পণ্যাত্মকতার কারণে (আদতে বাজারের কারণে), যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন গরীব লোকজনের ছেলেমেয়েরা আসতে পারে না বললেই চলে; সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন ছেলেমেয়ে আছে, যারা রিকশা ভাড়ার অভাবে হেটে হেটে ভালোবেসে ভালোবেসে বেড়ায় গোটা শহরজুড়ে, এখানেও দুপুরের খাবারের টাকা যোগাড় না করে দুজনে একটা খাবার ভাগ করে খায়। ওইসব জায়গায় ভালোবাসা থাকে! লেনদেন থাকে না। লেনদেন থেকে ভালোবাসাকে বাঁচানোর সংগ্রাম তাই আমাদের মানবীয়তাকে বাঁচিয়ে রাখবার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বাজারের যুগের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম।

যোজন; ২০১১

ওবামা-ওসামা লাইভ সম্প্রচার

আরব জাগরণের সময় হত্যা-সংবাদ আর লাদেন-ভাইরাস।

ওবামা কি মিথ্যে বলছেন? ওসামা কি বেঁচে আছেন এখনও? ওসামাকে কি আগেই মেরে ফেলা হয়েছে? প্রচারিত ছবিটি কি বানানো? লাশ সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হল দ্রুততার সাথে, সেটা কি এই কারণে যে, আসলে ওটা লাদেন ছিল না? লাদেনকে পাকিস্তানে লুকিয়ে রাখা কি আমেরিকার-ই চাল? এমন আরও হাজারো প্রশ্ন ছাপিয়ে অন্য একটা জিজ্ঞাসা এই মুহূর্তে জরুরি বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। সেটা হলো, যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সরাসরি (লাইভ) হাজির হলেন টিভি পর্দায় এবং ঘোষণা করলেন, ওসামা নিহত; ইতিহাসের এখনকার সেই গতিধারায় এই মৃত্যুসংবাদ আমাদের সামনে কোন কোন বাস্তবতা হাজির করে?

প্রথমেই খেয়াল করতে হয়, দেশ-বিদেশে প্রভাবশালী প্রায় সব সংবাদ মাধ্যমই 'লাদেন নিহত' শিরোনামে সংবাদ প্রচার করেছে। এটি ছিল আমেরিকার 'বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড; কিন্তু তাতে হত্যা শব্দটি উচ্চারণ না করে 'লাদেন নিহত' শিরোনামে সংবাদ প্রচার করেছে। পাঠক, লাদেন কি প্রাকৃতিক নিয়মে মারা গেছেন? তার কি অসুখ করেছিল? নাকি তিনি সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন? নাকি অন্য কোনোভাবে মারা গেছেন? এসব সম্ভাবনা যে নাই, তা তো একদমই পরিষ্কার। প্রথম দিনই মিডিয়া খবর ছড়িয়েছে, আত্মসমর্পণ না করে মার্কিন বিশেষ সেনাবাহিনীর সাথে গোলাগুলির এক পর্যায়ে লাদেন মারা গেছেন। তাহলে শুধু 'নিহত' শব্দে লাদেনের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হলো কেন? এইধরনের বন্দুকযুদ্ধে খুন হলে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে কিংবা উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়া বন্দুকযুদ্ধ অথবা ক্রসফায়ারে নিহত অন্তত লেখে। লাদেনের ক্ষেত্রে সেটাও না লিখে একেবারে নিহত করে দেয়া হলো তাকে। আর আমরাও অভ্যস্তভাবে পাঠ করলাম সেই সংবাদ।

আজকে এসে দেখছি, হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, অভিযানের সময় উনি নিরস্ত্র ছিলেন। আর মানব ঢাল হিসেবে একজন নারীকে ব্যবহার করার যে তথ্য হত্যাকাণ্ডের পরের দিন প্রচার করা হয়েছিল, তা অবশ্য আজ ক্রসফায়ার হয়ে গেছে। এখন হোয়াউট হাউস বলছে, লাদেন ক্রসফায়ারে মারা পড়েছেন (http://bdnews24.com/bangla/details.php?id=157428&cid=1)। ক্রসফায়ার সংবাদ পাঠের আনন্দ আমাদের বেড়ে গেল! বাংলাদেশে যখন নিও লিবারাল আইনের শাসনের সরকার আইন-সন্ত্রাসের কবলে ফেলে লিমনকে খুন করবার চেষ্টা করছে, যখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে ওসামার হত্যাকাণ্ডকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে বিবৃতি দিয়েছে সরকার, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে পাওয়া এই ক্রসফায়ারের খবর আমাদের রাষ্ট্রের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কিংবা বিচারিক সন্ত্রাসতন্ত্রকে আরও নিরঙ্কুশ করার বৈধতার দলিল দেয়। সাথে সাথে আমাদের ছাপা এবং বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোকেও এইসব

হত্যাকাণ্ডকে 'নিহত' হিসাবে শিরোনাম লেখার মাগনা তালিম দিয়ে যায়। আর সেটা গো-গ্রাসে গিলতেও থাকে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো।

যাইহোক, লাদেনের হত্যা-সংবাদ প্রচারের জন্য টিভির সামনে সরাসরি হাজির হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা (http://www.huffingtonpost.com/2011/05/02/osama-bin-laden-dead-obama-speech-video-transcript_n_856122.html) । হত্যা সংবাদ দিতে গিয়ে তিনি ৯/১১ টেনে আনেন। টেনে এনে জোড়া দেন আজকের যুগের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধের সাথে। জোড়া দিতেই হয়। কেননা ওই ৯/১১ই শেষ। আমার জানা মতে বৃহত্তর অর্থে এটাই একমাত্র ঘটনাও বটে, মার্কিন দুর্গে কেউ প্রত্যক্ষ অঘাত করেছিল! চমস্কি তখন বলেছিলেন, টুইন টাওয়ারের যে হামলাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐতিহাসিক-বলছে, তা ঐতিহাসিক এই হামলার ভয়াবহতা কিংবা ব্যাপকতার কারণে নয়, বরং এই কারণে যে, এই প্রথমবারের মতো বন্দুকের নল উল্টো দিকে ঘুরল। মানে যুগ যুগ ধরে যারা হামলাকারী, ৯/১১তে তারা হামলার শিকার হয়েছিলো। তারা যেন কারও হামলার শিকারই হতে পারে না। তাদেরকে আক্রমণ নিষিদ্ধ। তারা পবিত্র। দুনিয়া জুড়ে এমন ঐশ্বরিক ধারণা তারা কায়েম করেছে। বুশের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধের পরে তাই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ছেলে-বুশ, টুইন টাওয়ার হামলার পর। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এই যুদ্ধ নিরন্তর, অনন্ত। বুশ যুগ খতম হয়েছে। ওবামা এসেছিলেন দিন বদলের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কিন্তু একজন ব্যক্তি ওবামা ওয়াদা রাখতে পারেন না। মার্কিন রাষ্ট্রকাঠামো-অর্থনীতির যুদ্ধনির্ভরতা, বিশ্বব্যাপী জাতীয় সম্পদের উপর আগ্রাসন আর কর্পোরেট পুঁজির অবাধ বাজার নিশ্চিত করা, মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স রক্ষা করার জন্য, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিরাজমান কাঠামো অক্ষুণ্ন থাকে, ব্যক্তি ওবামা বিলীন হয়ে যায় মার্কেট-মিডিয়া-মিলিটারি 'থ্রি-এম যুগে'র গর্ভে। আর আর সে কারণেই ওবামার সরাসরি ভাষণে আবার ফিরে আসে ওসামা বিন লাদেন! ফিরে আসে মৃত্যু সংবাদ হয়ে। ফিরে আসে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বুশ ঘোষিত সেই অনন্ত যুদ্ধের এই নতুন পর্বের মৃত্যুসংবাদ হয়ে।

ওবামা-যুগে যাদের আর কোনো খবরই নাই, রাজনৈতিকভাবে যারা একেবারে মৃত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সৃষ্ট সেই আল কায়দা-প্রধান বিন লাদেনের হত্যার সংবাদ যেন সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী প্রতিপক্ষহীন যুদ্ধের গায়ে হাওয়া লাগায় আবার। কেননা সামনে নির্বাচন। যুদ্ধবাজ আমেরিকা কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে যুদ্ধ-ভীতি জারি রাখতে নিরাপত্তা ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়ে সার্ভিস খাতকে সঙ্কুচিত করতে করতে জনগণের নাভিশ্বাস তুলে ফেলেছে। আবার তো সেই পুরনো মদ গেলানো হবে। জাতীয় শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে জাতীয় নিরাপত্তা বাড়ানোর অজুহাত। আফগানিস্তান থেকে সেনা-প্রত্যাহারের শর্ত তৈরি করার চেষ্টাও কি এই মৃত্যুসংবাদের অন্তর্গত? হতেও পারে। এত এত যুদ্ধের দায় মেটানো সত্যিই কষ্টের। কষ্টের যে ভাষণে ওবামা নিজেও সেটাই বলেছেন।

হত্যাযজ্ঞ-ধ্বংসযজ্ঞ-যাই হোক না কেন, কোনোকিছু নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ব্যাখ্যা দেবার কোনো দায় নেই। ওবামা ভাষণে এটাকে আড়াল করেননি। এমন করেই ভাষণ দিয়েছেন তিনি, যাতে বোঝা গেছে; তিনি যদি বলেন লাদেন সেরা সন্ত্রাসী তাহলেই লাদেন সেরা সন্ত্রাসী এবং তাকে গুলি করে মারার নির্দেশ দেয়া যায়। এবং সেটা প্রকাশ্যে দেশের জনতার সামনে লাইভ শোনানো যায়। একেবারে পূর্বোক্তজনের নামোল্লেখ করে বলেছেন তিনি, বুশের মতো করে তিনিও ইসলামের বিরুদ্ধে না, যুদ্ধ করেছেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে ওবামা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, বুশ যুগ আর ওবামা যুগের কোনো পার্থক্য নাই। ওই যুগে যেমনটা ছিল, এই যুগেও তেমনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে দুনিয়াব্যাপী মার্কিন সন্ত্রাস জারি থাকবে। স্পষ্ট করে তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। বলেছেন,

> Yet his [Osama Bin Laden] death does not mark the end of our effort.There's no doubt that al Qaeda will continue to pursue attacks againstus.

মানে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা অব্যাহত থাকবে। সে যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে না সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে না কি অন্য কারও বিরুদ্ধে, সেটাও আমরা সবাই জানি। সবাই বুঝি। লাইভ ভাষণের শুরুতে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে অ্যাকশনের দিনক্ষণ নিয়ে বলতে গিয়ে ওবামা বললেন,

> ... And finally, last week, I determined that we had enough intelligence to take action, and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice.

শেষে এসে বললেন, Justice has been done. পাঠক, আমাদের লিপিবদ্ধ করে রাখা দরকার এই যুগপর্বকে যখন, বিশ্বের সব থেকে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রনায়ক গুলি করেও তার একান্তই নিজস্ব বিবেচনায় 'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন শুধু তাই নয়; প্রকাশ্যে সেটা ঘোষণা করতে পারেন লাইভ প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে।

আমরা সবাই মিডিয়ার সুবাদে জানি, লাইভ ভাষণ দিতে যাবার আগে হোয়াইট হাউসে বসে ওসামার বিরুদ্ধে পরিচালিত আবোটাবাদের অপারেশনের লাইভ উপভোগ করেছেন ওবামা-হিলারিরা (http://www.jjdin.com/?view=details&typye =single&pub_no=84&cat_id=1&menu_id=10&news_type_id=1&index=1)। তাদের প্রতিটা মুহূর্ত খুব উৎকণ্ঠায় যাচ্ছিলো। সময় যেন কাটছিলই না। অবশেষে ওবামা একসময় বলে উঠতে পারলেন, উই গট হিম! হত্যাযজ্ঞের এই লাইভ দর্শন, আর তার সংবাদ পত্রিকায় উপস্থাপনের এই যুগে আমরা মানুষের জীবনকে এতোটাই তুচ্ছ ভাবতে পারি যে, একটা হত্যাযজ্ঞকে আমরা লাইভ উপভোগ করি । কুখ্যাত সন্ত্রাসীও তো মানুষ! লাদেন লাদেন হয়ে জন্ম নেননি। মানুষ হয়েই জন্ম নিয়েছিলেন। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাই তাকে লাদেন বানিয়েছে, এটা সবাই জানে। বাজারের যুগ আর সবকিছুর মতো

মানুষের জীবনকেও পণ্য বানিয়ে ছাড়ে। পণ্য বানিয়ে তোলে হত্যাযজ্ঞের চলমানতাকে। কে জানে, খুব শীঘ্রই হয়তো লাদেনের হত্যাযজ্ঞের সিডি বাজারে পাওয়া যাবে। মিডিয়ার সুবাদেই বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসী কিংবা বীর হিসেবে আবার খ্যাত কিংবা কুখ্যাত হতে থাকবেন লাদেন। মিডিয়া লাদেনের গল্প বেচবে, বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ বেচবে, সফটওয়্যার-নির্মাতা ওবামা-অপারেশন নিয়ে হয়তো গেইম বানিয়ে বেচবে, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় দুনিয়ার দেশে খেলনা প্রস্তুতকারকরা লাদেন-বোমা বানিয়ে ১ টাকা ২ টাকায় বেচবে, আবারও কোথাও কোথাও শ্লোগান বিক্রি হবে লাদেনের নামে। আবার বাংলাদেশে নিপীড়িত মুসলমান হয়তো লাদেনকে নিপীড়ন-বিরেধিতার প্রতীক বানিয়ে নতুন কোনো ব্যানারে সংগঠিত হবে। ওদিকে ওবামা জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাত বেচবে নির্বাচন জেতার স্বার্থে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে বাজার ব্যবস্থার স্বার্থে।

তার মানে পাঠক, খেয়াল করে দেখেছেন কি, লাদেনের হত্যা সংবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে মৃত লাদেন আবার জীবিত হলেন! আজ খবরের অনলাইন ঠিকানায় পড়লাম ওসামা ভাইরাসের খবর! এটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে। ফেইসবুকে যে ভাইরাসটা প্রতিনিয়ত সামলাতে হচ্ছে আমাকেও! দুনিয়াব্যাপী মানুষের এবার সামলাতে হবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবিত হয়ে ওঠা লাদেনকে, তার ভাইরাসকে। এইসব ভাইরাস অতিক্রম করেই আমাদের বুঝে নিতে হবে মৃত্যু সংবাদের রাজনীতি। আমাদের সাথে আছে জাগ্রত আরব-ভূমি। বিন লাদেন কিংবা আল কায়দার জনবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাস নয়, আরবের জনজাগরণ আমাদের মনে করিয়ে দেবে বারবার, লাদেন হত্যার মধ্য দিয়ে মৃত আল কায়েদাকে যতোই জীবিত করার চেষ্টা করা হোক, আরবভূমিতে মানুষের জাগরণ ঠেকানো যাবে না।

আশাবাদী আমি। স্বপ্ন দেখি, সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন এইসব সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতকে প্রবলভাবে রুখে দেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই মানুষ। ঘিরে ফেলা হোয়াইট হাউসে বসে খোদ মার্কিন-জনজাগরণের লাইভ দেখবেন অচিরেই, কোনো এক মার্কিন প্রেসিডেন্ট! লাইভ দেখবেন!

রাজনৈতিক ডট কম; ২০১১

মিডিয়ার গর্ভে ঐশ্বরিয়ার অনাগত 'জমজ' সন্তান

গর্ভধারণ কোনো চমকপ্রদ ঘটনা নয়। নারী-পুরুষের যৌথ সৃজন-ক্রিয়ার প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতায় নারী শরীরে ধারণ করে নতুন আরেকটা শরীর। মানব ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারা এই গর্ভধারণ। তাই নারীর গর্ভধারণ কোনো সংবাদযোগ্য ঘটনা নয়। কিন্তু সেই গর্ভধারণও খবর হতে পারে যখন ধারণকারী ঐশ্বরিয়া রাই! তাও আবার এক সন্তান নয়। একসাথে নাকি তার মতোই সুন্দরী দুই সন্তানের জননী হবেন

তিনি। 'ভাভিক সাংভি জানান, ঐশ্বরিয়ার ভাগ্য সংখ্যা ৫। আর অভিষেকেরও সংখ্যাও ৫। এই সংখ্যা দুটি এক হওয়া মানে বুঝায়, তাঁদের যমজ সন্তান হবে। তবে এক্ষেত্রে মেয়ে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাটাই খুব বেশি।' এই ভাগ্যগণনাকারী চিকিৎসাবিজ্ঞান মোতাবেক ভাগ্য গণনা করেন কিনা জানি না, তবে ৩৫ এর পর গর্ভধারণ করলে জমজ সন্তান হবার সম্ভাবনা থাকে বলে জেনেছি! ভাভিক আরও জানিয়েছেন, ঐশ্বরিয়ার গর্ভের সন্তান দেখতে তার মায়ের মতই সুন্দরী হবে, কিন্তু তার উচ্চতা হবে বাবা অভিষেকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।' শুধু এই নয়, এই গর্ভধারণ নিয়ে আরও কত খবর প্রতিদিন সমানে প্রকাশ করে যাচ্ছে মিডিয়া ।

সাংবাদিকতার বিদ্যায়তনিক শাস্ত্র আমাদের সংবাদ চিনতে শেখায়। সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে আর সংবাদকর্মীরা সংবাদ-সম্পাদকের ডেস্কে শিখে নেন যে, সব সংবাদ ঘটনা হলেও সব ঘটনা সংবাদ নয়। প্রতিনিয়ত ঘটে চলা অসংখ্য ঘটনার মধ্যে থেকে সেই ঘটনাগুলোই সংবাদ হয় যেগুলো চমকপ্রদ অথবা সহিংস কিংবা যৌন-উত্তেজক অথবা বিস্ময়কর-অস্বাভাবিক। সাংবাদিকতার পরিভাষায় এগুলো হলো সংবাদযোগ্য ঘটনা।

ঐশ্বরিয়া রাই সেলিব্রেটি। ঐশ্বরিয়া রাই বিশ্বসুন্দরী-সেক্সি-নায়িকা-মডেল। সবমিলে পাশ্চাত্য ছাঁচের সৌন্দর্য উৎপাদনযন্ত্রের মাপে তিনি একজন বিশ্বসুন্দরী। বিশাল বাজার ভারতের একজন শীর্ষস্থানীয় পণ্য-মডেল তিনি। কিন্তু একজন মানুষ সমাজে একটি পরিচয়ের মধ্যে বিরাজিত থাকে না। ঐশ্বরিয়া তাই আবার ভারতীয়। ঐশ্বরিয়া আবার হিন্দু। ঐশ্বরিয়া আবার বচ্চন পরিবারের বধূ। ঐশ্বরিয়া আবার নারী। শুধু নারী না। তিনি আবার ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির (ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি বলে একাট্টা কোনো সংস্কৃতি নেই। আমি বোঝাতে চেয়েছি ভারতের প্রাধান্যশীল সংস্কৃতিকে, যা প্রাচীনতা আর আধুনিক-পাশ্চাত্যের যুগল মূল্যবোধ। এই সংস্কৃতি এটা সহ্য করে যে, ঐশ্বরিয়া

কাপড় খুলে নাচবে কিন্তু সহ্য করবে না তিনি যদি বলে-কয়ে অন্য পুরুষের সাথে শুয়ে পড়েন। ভারতীয় হিন্দু নারী ঐশ্বরিয়াকে বচ্চন পরিবারের বধু হিসেবে দেখতেই ভারতের প্রাধান্যশীল সংস্কৃতি স্বস্তিবোধ করে।) নারী। তাই ঐশ্বরিয়া রাই বধু হয়েছেন একদিন। তার ৪ বছর পর আজ তিনি আরেকটি প্রাকৃতিক পরিচয়ের অন্তর্ভূক্ত হতে চলেছেন। আর সব নারীর মতো করে নারী ঐশ্বরিয়ার সেই অনন্য নারীত্বের বৈশিষ্ট্য, নিজ শরীরে আরেক শরীর ধারণের অনন্য সক্ষমতা বিকশিত হতে চাইছে। তিনি মা হতে চলেছেন। কিন্তু আর সব নারী খবর হয় না, খবর হয় ঐশ্বরিয়া। কারণটা ওই নারী পরিচয়-এর বাইরে ঐশ্বরিয়ার অন্যসব অবস্থান।

ঐশ্বরিয়ার শরীর পুরুষতান্ত্রিক অবদমনের পুঁজিবাদী তৎপরতায় গড়ে ওঠে পাশ্চাত্যের সৌন্দর্য পরিমাপকযন্ত্রের ছাঁচে। কর্পোরেট পুঁজি সৌন্দর্যের কর্পোরেটাইজেশন করতে গিয়ে একক-একমুখী সৌন্দর্য উৎপাদন করে। ফর্সাই সুন্দর, স্লিম ফিগার সুন্দর, বুকের মাপটা এই হবে, কোমরের মাপটা এই, পুরুষের পেশী শক্তিশালী হবে, নারীর কোমর পাতলা হবে এইসব লিখিত-অলিখিত নির্দেশনার মধ্যে দিয়েই বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার মতো প্রতিযোগিতাগুলোতে সৌন্দর্যের পরিমাপ হয়। ঐশ্বরিয়া ঐ পরিমাপক যন্ত্রে উৎড়ে গেছেন বহু আগে। তারপর থেকে তাকে পণ্য-মডেল বানিয়ে দুনিয়াজুড়ে শুধু পণ্য না, কেনা-বেচা করা হয়েছে মূল্যবোধও। এখনও সেটা করা হচ্ছে। বধূ হয়েও তাই ঐশ্বরিয়া এখনো আলোচ্য কেননা ঘরের বউয়ের ভারতীয় ইমেজ আর পাশ্চাত্য আদলের সেক্সি ইমেজ নিয়ে এখনও আছেন ক্যামেরার প্রাধান্যশীল দৃশ্যমানতায়। দৃশ্যমানতায় তিনি একজন সেক্সি নায়িকা/মডেল যার দেহকে উপজীব্য করে এখনও কেনাবেচা করা হচ্ছে, করা যাচ্ছে।

এই প্রাধান্যশীল দৃশ্যমানতার মধ্যেই প্রতিদিন আড়াল হয়ে যায় এই খবর যে পাশ্চাত্য নির্মিত তৃতীয় দুনিয়া নামের আমাদের এই জনপদে আজও সবার জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা যায়নি। ২০০৮ সালের হিসেবে খোদ ভারতবর্ষে প্রতি ১ লাখে ২৩০ জন গর্ভকালীন মৃত্যুর শিকার হয়। আরেকটি খবর আমরা জানি যে ৩৫ বছর পর নারীর গর্ভধারণ নানা কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। এই বয়সের স্বাভাবিক কিছু বৈশিষ্ট্যও গর্ভধারণের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে । গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ৩৫-৩৯ এই সীমার মাঝে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মহিলা গর্ভধারণ ও প্রসবকালে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। ৩৫ এর পর যমজ সন্তান প্রসবের হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পায় । শিশুর down syndrome এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে । ৩০ বছরে এর আশঙ্কা থাকে প্রতি ১০০০ শিশুর মাঝে একটি, ৩৫ বছরে প্রতি ৪০০ শিশুর মাঝে একটি এবং ৪০ এ গিয়ে সেটাই দাঁড়ায় প্রতি ১০০ শিশুর মাঝে একটি । ৩৫-৪০ বছরের মাঝে মায়ের অকাল গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে ২০ শতাংশ। এছাড়াও এই সময়ে গর্ভ ধারণের ক্ষেত্রে Gestational diabetes, High blood pressure, Placental problems Premature -এর শারীরিক ঝুঁকি আছে । ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ

হবার কারণে (non-disjunction) এই সময়ে বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম হবার সম্ভাবনাও বেশি থাকে । ইউকে-তে দেখা গেছে ৩৫ এর পর থেকে নারীদের মাঝে induction of labour, instrumental delivery and delivery by caesarean section এর হার আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়ে যায় । ডিম্বাণুর গুণাগুণও এসময়ে হ্রাস পায় । ফলে তা ভ্রূণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

কিন্তু এতোসব ঝুঁকির মধ্যেও গর্ভধারণ করেন ঐশ্বরিয়া। তার বিশ্বসুন্দরী-সেক্সি-নায়িকা পরিচয়, মানে পুঁজির দাসত্ববরণের ভোগবাদী পুরুষতান্ত্রিক পরিচয় আর বচ্চন পরিবারের পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষার মানে পুরুষানুক্রমে বংশধর রাখবার দায়িত্বজনিত বধূ পরিচয়ের সংঘর্ষে কিংবা ঐক্যে যখন ৩৭ বছরে ঝুকিপূর্ণ গর্ভধারণ করেন ঐশ্বরিয়া; তখন আমাদের টের পেতে হয় এতবড় সেলিব্রেটিও নারী পরিচয়ের কারণে পুরুষতান্ত্রিক অবদমনের রাজনীতি থেকে মুক্ত নন। ঐশ্বরিয়া সামন্ত বাঁধনে বন্দী ভারতীয় নারী। খুব চটেছেন বলিউডের পরিচালক রামগোপাল ভার্মা। বলেছেন তিনি, 'আমি সুন্দরীদের পূজা করি। কিন্তু তাঁদের মা হতে দেখলে আমার ঘৃণা হয়। ঐশ্বরিয়ার ক্ষেত্রে আমার আরও বেশি ঘৃণা হচ্ছে। কারণ ও আমার কাছে বিশ্বের সুন্দরীতম নারী'- নিজের ব্লগে এভাবেই লিখেছেন তিনি। কিন্তু চটে লাভ নাই। শুধুই যৌন-কামনা-বাসনার জায়গা থেকে দেখবার চোখওয়ালা বলিউডের পরিচালক কিংবা অন্য পুরুষের সামনে দৃশ্যমান সৌন্দর্য/যৌনতা-পণ্য পরিচয়ে যে নারীটি হাজির হয় ঐশ্বরিয়া নামে, সেই ভারতীয় হিন্দু বধু সেক্সি মডেলের নারীটির পক্ষে আর সব পরিচয় ছাপিয়ে যাওয়া সব সময় সম্ভবপর হয় না।

সবমিলে ঐশ্বরিয়া পুরুষতান্ত্রিক অবদমনের শিকার হচ্ছেন বেশি বয়সে গর্ভধারণ করে আর হাজারো পুরুষের বিকৃত যৌন-আকাঙ্ক্ষা মেটাচ্ছেন মিডিয়ার খবর হিসেবে বিক্রি হয়ে। সন্তানের মা-ও হবেন তিনি। তাই আরসব পরিচয় মুছে গেলে ঐশ্বরিয়ার যে মানুষ পরিচয়, নারীত্বের প্রাকৃতিক পরিচয় সেটা যখন মনে স্পষ্ট হয় তখন সব ভাবনা ছাপিয়ে প্রাধান্যশীল হয় অন্য ভাবনা। ভাবনাটা হলো, ঐশ্বরিয়া নামের নারীটি কি এই সাইত্রিশে এসে সুস্থভাবে মা হতে পারবেন?

রাজনৈতিক ডট কম; ২০১১

GRONTHO.COM

মৌমাছি আর এই যুগের মানুষেরা

ঘর থেকে বের হয়ে আপন সেই ঘরে না-ফেরার ঘটনাটা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। শিশু স্কুলে গিয়ে ঘরে ফেরে না। চাপা পড়ে যায় পুঁজিবাদের মতোই গতিশীল ও নিয়ন্ত্রণহীন কোনো বাসের নিচে। ঘরে ফেরে না ব্যবসায়ী-শিক্ষার্থী-রাজনীতিক-অপরাধীসহ অনেক মানুষ। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের 'ক্রসফায়ার' কিংবা দুর্বৃত্তদের মারণাস্ত্র তাদের লাশ বানিয়ে ফেলে। সংবাদপত্রের পাতায় কিংবা টিভি চ্যানেলের নিউজে কিংবা একেবারেই তথ্যমাধ্যমের আড়ালে এসব না-ফেরার গল্প লিপিবদ্ধ হতে থাকে প্রতিদিনকার বাস্তব হিসেবে। কিন্তু মানুষের কথা নয়, ঘরে না-ফেরা আরেকটি প্রজাতির কথা বলব আজ।

বলব মৌমাছির কথা। আমরা আমাদের ছেলেবেলা/মেয়েবেলায় পড়েছিলাম, 'নাচি নাচি' মধু সংগ্রহে যায় তারা। একটি মৌমাছি যখন মধুর সন্ধান পায়, মৌচাকে ফিরে সে নাচতে শুরু করে। তখন সব মৌমাছি মিলে লেজ ও পাখা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শেকলের মতো আকার ধারণ করে। সেই শেকলের নির্দিষ্ট কোণ বলে দেয়, মধুর উৎস কোনদিকে। দক্ষ জ্যামিতিবিদের মতো করে মৌমাছিরা তখন সংঘবদ্ধভাবে মধু আহরণে যায়, আবার ফিরে আসে মৌচাকে। আজ কৈশোর-উত্তীর্ণ বড়বেলায় এসে আমি জেনে গেছি, ঘরে ফিরছে না মৌমাছিরা। আমাদের দেশেই নয় কেবল, স্পেন, ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া, পোল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, গ্রিস, পর্তুগাল ও জার্মানিতে মৌমাছি ও মৌচাক ব্যাপক পরিমাণে বিলুপ্ত হওয়ার খবর মিলেছে।

কৃষিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কীটনাশক, প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহারের আধিক্য, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কৃষি ও বনায়নে মনোকালচার প্রতিনিয়ত চূড়ান্ত করে যাচ্ছে এই মহামূল্যবান প্রজাতির বিলোপ প্রক্রিয়া। মৌমাছি বিলোপের আরেকটি ভয়ঙ্কর এবং যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণসাপেক্ষ কারণ হলো মোবাইল ফোন টাওয়ার। মৌমাছিরা যে পথ হারিয়ে ফেলছে তার একটা বড় কারণ মোবাইল ফোনের টাওয়ারগুলো থেকে বেরিয়ে আসা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ (ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস)। টাওয়ার থেকে নির্গত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস খুব দ্রুত মৌমাছিদের দিক নির্ণয় ক্ষমতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অর্থাৎ মৌমাছি-পরিবারে যাদের ওপর ফুলের মধু সংগ্রহের কাজ বর্তায়, তাদের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষমতা লোপ পায়। ফলে কর্মী মৌমাছিরা পথ হারিয়ে

ফেলে আর ডিমগুলো নিয়ে একা হয়ে পড়ে বেচারা রাণী মৌমাছি। ফলে মাত্র ১০ দিনেই তারা মুষড়ে পড়ে।

ভারতের কেরালা রাজ্যে মৌমাছির মাত্রাতিরিক্ত বিলোপের ফলে পরিচালিত এক গবেষণায় এর সত্যতা মিলেছে। এ ছাড়া বিখ্যাত লানডাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জোসেন কুন পরিচালিত গবেষণা অনুযায়ী মোবাইল ফোন চালু রাখলে মৌমাছি নিকটবর্তী মৌচাকে ফিরতে অপছন্দ করে।

আমরা এই বাজারের যুগের যন্ত্রমানবেরা মুনাফার স্বার্থে কত কিছুই না বানালাম। খেয়াল করলাম না, তাতে প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশ-ব্যবস্থার কী হাল হবে। কর্পোরেট ল্যাবরেটরির বিজ্ঞান শুধু মুনাফা বোঝে। উৎপাদনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, মানুষ স্বয়ং নয়। আর তাই প্রকৃতিবিনাশী উৎপাদন এ যুগের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। বৈশ্বিক উষ্ণতার যে অভিঘাত মানুষকে ধ্বংসের কিনারে এনে ঠেকিয়েছে, সেটিও তো মুনাফাবাজ উৎপাদন-পদ্ধতিরই ফলাফল। প্রকৃতির ওপর আধিপত্যকে ন্যায়সংগত করার এই মুনাফাবাজ উৎপাদন পদ্ধতি জীববৈচিত্র্য আর বাস্তুসংস্থান ধ্বংস করে খোদ পৃথিবীর অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। মৌমাছি তারই একটি যোগ্য উদাহরণ।

মৌমাছি যে মধু সংগ্রহ ও উৎপাদন করে, তা কেবল পুষ্টি ও ঔষধিগুণে সমৃদ্ধ, আর অনেক মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতই নয় শুধু; আমাদের এই বসুধার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আর তার বিকাশে অন্যতম প্রধান শক্তি এই মৌমাছি। লক্ষাধিক উদ্ভিদ তাদের পরাগায়ণের জন্য সরাসরি মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল। দেশের একজন পরিবেশবিজ্ঞানীর তথ্যমতে, একটি মৌচাকে যত মৌমাছি বাস করে, তার চারপাশে ৪০০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে যত ফুল ফোটে, একদিনে সেগুলোতে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ ও পরাগায়ণ করতে সাহায্য করে ওই সব মৌমাছি। একবার ভেবে দেখেছেন পাঠক, একদিন এমন যদি হয় যে; আমাদের ফুল-ফল-শস্যক্ষেতে আর কোনো মৌমাছি আসছে না! তাতে পরাগায়ণ হবে না, আর আমরা শুধু ফুল-ফল-শস্য থেকে বঞ্চিত হব না, হুমকির মুখে পড়বে আমাদের প্রাকৃতিক উৎপাদন, আমাদের জীববৈচিত্র্য, আমাদের বাস্তুসংস্থান। তাতে কিন্তু বিলুপ্ত প্রজাতির তালিকায় মৌমাছির পর পর্যায়ক্রমে চলে আসবে মানুষেরও নাম! অবশেষে গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে!

তখন মানুষ আর মৌমাছির ঘরে না-ফেরার গল্প লেখারও কেউ থাকবে না। তাই বিলুপ্তপ্রায় এই প্রজাতিকে রক্ষা করা দরকার। সেলফোনসহ মৌমাছির জন্য হুমকি বয়ে আনে এমনসব প্রযুক্তিকে পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ামূলক সম্পর্কে সম্পর্কিত করার জন্য গবেষণা দরকার। কিন্তু অন্ধ বাজার কি মুনাফার গন্ধবিহীন এসব কথা শুনবে?

কালের কণ্ঠ ২০১০

GRONTHO.COM